

লাল - সবুজ  
দাগানো  
**TEXT BOOK**



প্রাণিবিজ্ঞান

*New Edition*

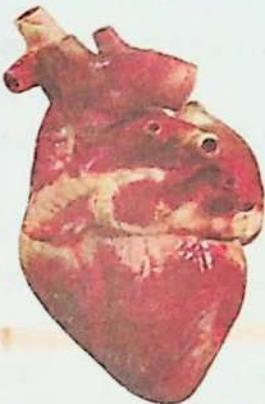


**উমেষ**

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

## অধ্যায় ৮

# মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সংক্ষিপ্ত Human Physiology : Blood & Circulation



মানবদেহের অভ্যন্তরে এক বিশেষ তন্ত্র খাদ্যসার, ধূসন গ্যাস ও রেচন বর্জ্য পরিবহন এবং দেহের তাপমাত্রা ও বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও রোগজীবাণু প্রতিরোধের কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত। এর নাম রক্ত সংবহনতত্ত্ব।

রক্তবাহিকাসমূহ এবং হৃৎপিণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে সংক্ষিপ্ত হয় তাকে রক্ত সংবহনতত্ত্ব বলে। বিটিশ চিকিৎসক Willium Harvey, 1628 খ্রিস্টাব্দে মানুষের রক্ত সংবহন সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে মানব রক্ত সংবহনতত্ত্ব এবং হৃৎপিণ্ডের কিছু জটিলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

### প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> রক্ত            | <input type="checkbox"/> ব্যারোরিসেপ্টর      |
| <input type="checkbox"/> রক্ত তন্ত্র     | <input type="checkbox"/> অ্যানজাইনা          |
| <input type="checkbox"/> লসিকা           | <input type="checkbox"/> হার্ট অ্যাটাক       |
| <input type="checkbox"/> টনসিল           | <input type="checkbox"/> পেস মেকার           |
| <input type="checkbox"/> কার্ডিয়াক চক্র | <input type="checkbox"/> অপেন হার্ট সার্জারি |

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা
<input type="checkbox"/> রক্তকণিকা ও লসিকা সম্পর্কে	পাঠ ১ রক্ত
<input type="checkbox"/> রক্ত জমাট বাঁধার কারণ	পাঠ ২ রক্তকণিকা
<input type="checkbox"/> ব্যবহারিক : রক্তের কণিকাসমূহ শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন	পাঠ ৩ লসিকা
<input type="checkbox"/> হৃৎপিণ্ডের গঠন	পাঠ ৪ রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ত তন্ত্র
<input type="checkbox"/> হার্টবিটের দশাসমূহের ব্যাখ্যা	পাঠ ৫ ব্যবহারিক : রক্তকণিকাসমূহের স্থায়ী স্থাইড পর্যবেক্ষণ
<input type="checkbox"/> হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে SA নোড, AV নোড এবং পারকিনজি আংশের ভূমিকা	পাঠ ৬ হৃৎপিণ্ডের গঠন
<input type="checkbox"/> মানবদেহে রক্ত সংবহন পদ্ধতির তুলনা	পাঠ ৭ হৃদস্পন্দন ও এর বিভিন্ন দশা
<input type="checkbox"/> হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থা ও করণীয়	পাঠ ৮ হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ
<input type="checkbox"/> হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক রক্ত সংবাহনে পেসমেকারের কার্যক্রম	পাঠ ৯ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টর ও আয়তন রিসেপ্টরের ভূমিকা
<input type="checkbox"/> ওপেন হার্ট সার্জারি, করোনারি বাইপাস এবং এনজিওপ্লাস্টিক ব্যাখ্যা	পাঠ ১০ মানবদেহে রক্ত সংবহন
	পাঠ ১১ হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থা ও করণীয়
	পাঠ হৃদরোগের চিকিৎসা

### রক্ত (Blood)

রক্তরস নামক তরল মাতৃকায় ভাসমান বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত টিস্যুকে রক্ত বলে। রক্তের মাধ্যমে বিভিন্ন রক্তবাহিকা দেহের সকল কোষে পৃষ্ঠি, ইলেক্ট্রোলাইট, হরমোন, ভিটামিন, অ্যান্টিবডি,  $O_2$ , ইমিউন কোষ ইত্যাদি বহন করে এবং  $CO_2$  ও বর্জ্য পদার্থ প্রত্যাহত হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানবদেহে প্রায় ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে অর্থাৎ দেহের মোট ওজনের প্রায় ৮%। MAT: 20/21 রক্ত সামান্য ক্ষারীয়। এর pH মাত্রা ৭.৩৫-৭.৪৫ (গড়ে ৭.৪০) এবং তাপমাত্রা ৩৬-৩৮° সেলসিয়াস। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানির চেয়ে বেশি, প্রায় ১.০৬৫। অজৈব লবণের উপস্থিতির জন্য রক্তের স্বাদ নোনতা। সুনির্দিষ্ট বাহিকার মাধ্যমে রক্ত দেহের সবখানে সংক্ষিপ্ত হয়।

### রক্তের সাধারণ কার্যাবলি (General Functions of Blood)

১. **পুষ্টিদ্রব্য পরিবহন :** বিভিন্ন খাদ্যসার যেমন-গুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল এবং ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি অন্ত থেকে রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছে।
২. **শ্বেত গ্যাস পরিবহন :** রক্ত  $O_2$  কে ফুসফুস থেকে দেহকোষে এবং দেহকোষ থেকে  $CO_2$  কে ফুসফুসে পরিবহন করে। এরিথ্রোসাইট (RBC) ও প্লাজমা প্রধানত এ কাজে অংশ গ্রহণ করে।
৩. **বিপাক নিয়ন্ত্রক দ্রব্যাদি পরিবহন :** রক্ত হরমোন, ভিটামিন, অ্যান্টিবডি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থগুলোকে তাদের ক্রিয়াস্থলে বহন করে নিয়ে যায়।
৪. **বর্জ্য পদার্থ পরিবহন :** কোষীয় বিপাকে সৃষ্টি বর্জ্য পদার্থ, যেমন-ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, বিলিরুবিন,  $CO_2$  দেহ থেকে অপসারণের জন্য বৃক্ত, যকৃত, ফুসফুস, ঘর্মগ্রহি ইত্যাদি অঙ্গে পরিবহন করে।
৫. **পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ :** রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে এবং প্রোটোপ্লাজমে পানি সরবরাহ করে। আবার পানির পরিমাণ বেড়ে গেলে রক্ত অতিরিক্ত পানি বৃক্তে প্রেরণ করে মৃত্রক্রপে বর্জন করে। এভাবে রক্ত দেহের পানিসাম্য বজায় রাখে।
৬. **দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ :** রক্ত অধিকতর সক্রিয় টিস্যুতে (যেমন-পেশি, যকৃত) উৎপন্ন তাপের সারাদেহে বিস্তার ঘটিয়ে দেহের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখে। আবার কোনো কারণে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে রক্ত দ্রুত দেহের পরিধিতে সম্প্রসারণ হয়। এসময় বাস্পীভবনের ফলে দেহের পরিধি দিয়ে তাপ নির্গত হয়। এভাবে রক্ত দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
৭. **সংক্ষয় অঙ্গ থেকে খাদ্য পরিবহন :** রক্তের মাধ্যমে প্রয়োজনে সংক্ষয় অঙ্গ থেকে খাদ্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতিমে পরিবাহিত হয়ে থাকে।
৮. **সংক্ষয় ভাস্তর :** প্লাজমা প্রোটিন দেহের প্রোটিনের সংক্ষয় ভাস্তর হিসেবে কাজ করে। রোজা অথবা উপবাসের সময় এবং খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ কমে গেলে দেহের টিস্যুগুলি উক্ত সংক্ষয়ভাস্তর থেকে প্রোটিন গ্রহণ করতে পারে।
৯. **আয়নের সমতা রক্ষা :** রক্ত দেহের কোষ এবং তার চারদিকে অবস্থিত তরলের মধ্যে আয়নের সমতা বজায় রাখে।
১০. **অস্ত্র-ক্ষারের সাম্যাবস্থা ( $pH$ ) নিয়ন্ত্রণ :** প্লাজমা ও লোহিত কণিকার ভিতর বিভিন্ন বাফার দ্রব্যের উপস্থিতির জন্য দেহের অস্ত্র-ক্ষারের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে।
১১. **রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ :** রক্তে অগুচক্রিকা ও প্লাজমা প্রোটিন সম্মিলিতভাবে ক্ষতস্থানে রক্তত্বক্ষণ ঘটিয়ে দেহের রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ করে।
১২. **দেহের প্রতিরক্ষা :** রক্তের শ্বেতকণিকা (WBC) ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় এবং অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করে দেহের প্রতিরক্ষায় অংশ নেয়।
১৩. **অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষা :** রক্ত দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ভারসাম্য বা হোমিওস্ট্যাসিস (homeostasis) রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
১৪. **রোগ নির্ণয় :** রোগ, সংক্রমণ বা অন্য কোন কারণে দেহের কোনোরকম পরিবর্তন ঘটলে রক্তের উপাদানের পরিবর্তন দেখা যায়। এ কারণে রক্তের রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় (clinical diagnosis) করা হয়।

### রক্তের উপাদান (Components of Blood)

টেস্টটিউবে রক্ত নিয়ে সেন্ট্রিফিউগাল ঘন্টে ঘুরালে রক্ত দুটি শরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উপরের হালকা হলুদ বর্ণের প্রায় ৫৫% অংশের শরাটি রক্তরস বা প্লাজমা (plasma) এবং নিচের গাঢ়তর বাকি ৪৫% অংশ রক্তকণিকা (blood corpuscles)। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তকণিকাগুলো রক্তরসে ভাসমান থাকে। লোহিত কণিকার আধিক্যের কারণে রক্ত লাল দেখায়।

### রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma)

রক্তরস বা প্লাজমা হচ্ছে রক্তের হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশ। এতে পানির পরিমাণ ৯০-৯২% এবং দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ ৮-১০%। রক্তরসের কঠিন পদার্থ বিভিন্ন জৈব (৭-৯%) ও অজৈব (০.৯%) উপাদান নিয়ে গঠিত। কয়েক ধরনের গ্যাসসহ রক্তরসে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো উপস্থিতি।

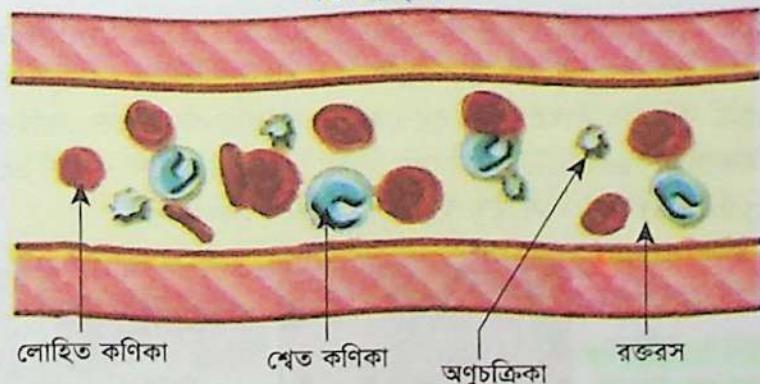
**ক. অজৈব পদার্থ (Inorganic constituents) :** রক্তরসে অজৈব পদার্থের পরিমাণ প্রায় ০.৯%। এর মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, তামা, আয়োডিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

**খ. জৈব পদার্থ (Organic constituents) :** রক্তের জৈব উপাদানগুলো হচ্ছে:

- প্লাজমা প্রোটিন (Plasma protein) :** জৈব পদার্থের মধ্যে প্লাজমা প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় ৭.৫%। প্লাজমা প্রোটিনের মধ্যে অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোথ্রিন, ফাইব্রিনোজেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
- নাইট্রোজেনঘঠিত রেচন পদার্থ (Nitrogenous excretory products):** রেচন পদার্থের মধ্যে রয়েছে- ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়োটিনিন, জ্যানথিন, অ্যামেনিয়া ইত্যাদি।
- অন্যান্য পদার্থ :** গুকোজ, ফ্যাট, কোলেস্টেরল, হরমোন, বিভিন্ন প্রকার এনজাইম রক্তরসে অবস্থান করে। বিভিন্ন ভিটামিন, রঞ্জক পদার্থ (বিলিরবিন, ক্যারোটিন) ইত্যাদিও রক্তরসে পাওয়া যায়।

**রক্তরসের কাজ :** (i) রক্তের তারল্য রক্ষা করে এবং ভাসমান রক্ত কণিকাসহ অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থ দেহের সর্বত্র বহন করে। (ii) পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গে বাহিত হয়। (iii) টিস্যু থেকে নির্গত বর্জ্যপদার্থ রেচনের জন্য বৃক্কে নিয়ে যায়। (iv) টিস্যুর অধিকাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্তরসে চির ৪.১ রক্তরস ও কণিকার পরিমাণ বাইকার্বনেটকুপে দ্রবীভূত থাকে। (v) অন্ন পরিমাণ অক্সিজেন বাহিত হয়। (vi) লোহিত কণিকায় সংবন্ধ হওয়ার আগে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসেই দ্রবীভূত হয়। (vii) রক্তরসের মাধ্যমে হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে বাহিত হয়। (viii) রক্তরস রক্তের অন্তর্কারের ভাসমান্য রক্ষা করে। (ix) রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিবহন করে। (x) যকৃত, পেশি ইত্যাদি অঙ্গে উৎপন্ন তাপশক্তিকে সমগ্র দেহে বহন করে দেহে তাপের সমতা রক্ষা করে।

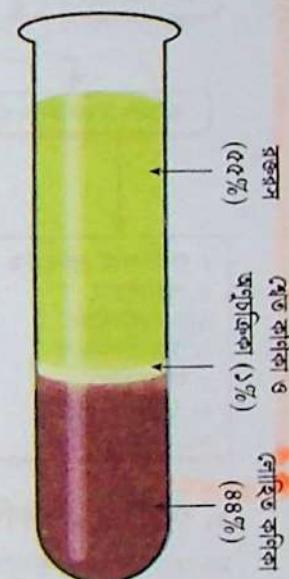
### রক্ত বাহিকা



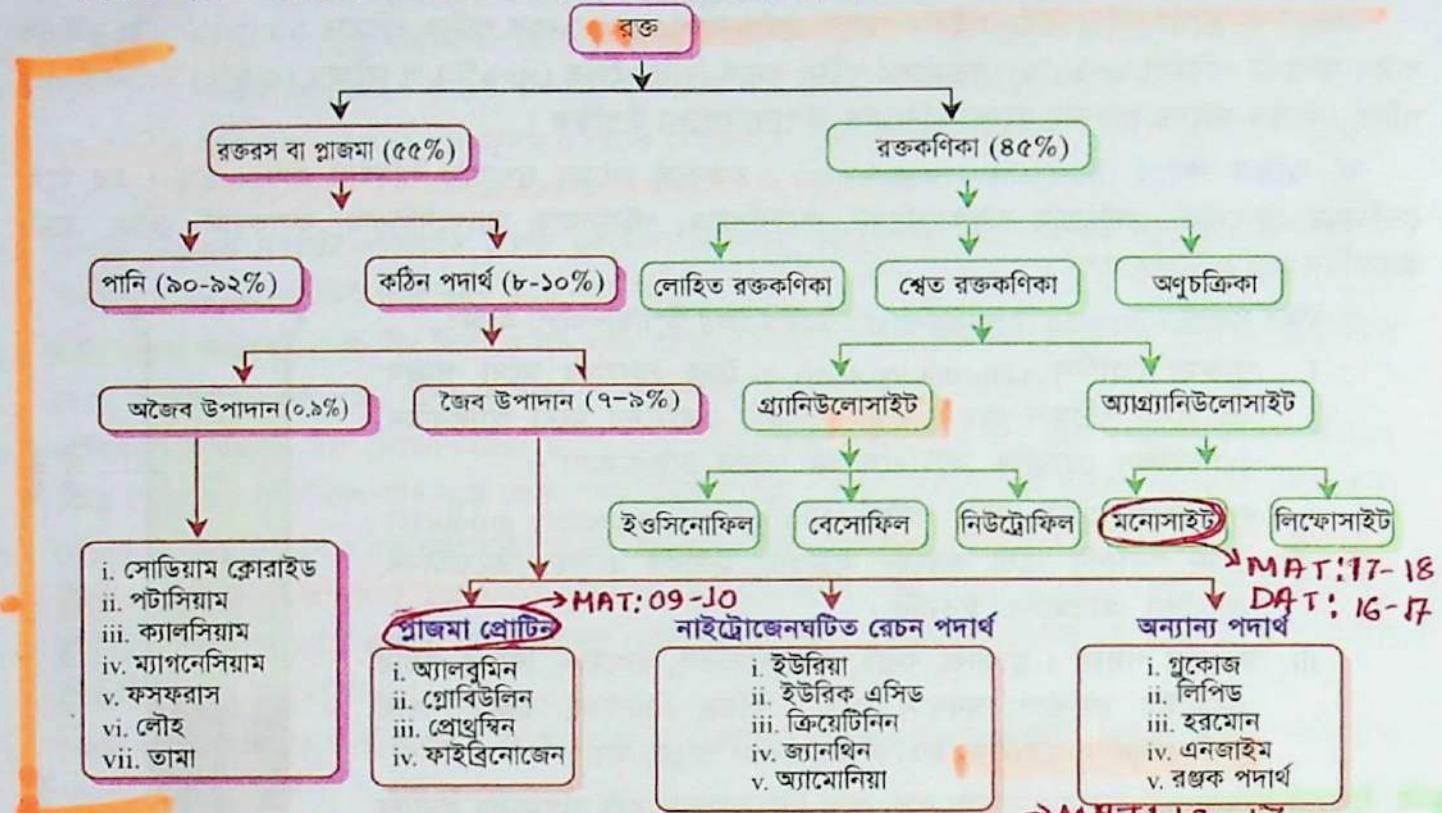
চির ৪.২ : রক্ত বাহিকার ভিতরে রক্তের উপাদানসমূহ

### রক্তকণিকা (Blood Corpuscles)

রক্তের উপাদান হিসেবে ভাসমান বিভিন্ন কোষকে রক্তকণিকা বলে। এগুলো হিমাটোপয়েসিস (hematopoiesis) প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। অন্যান্য কোষের মতো স্ববিভাজিত হয়ে সৃষ্টি হয় না বলে এদের কোষ না বলে কণিকা বলা হয়। রক্তের ৪৫% হলো রক্তকণিকা যা রক্তরসের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। রক্তকণিকা তিন ধরনের, যথা- এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা, লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা ও প্রেইটলেট বা থ্রুবোসাইট বা অনুচক্রিকা।



নিচের ছকের মাধ্যমে রক্তের উপাদানগুলো দেখানো হলো।

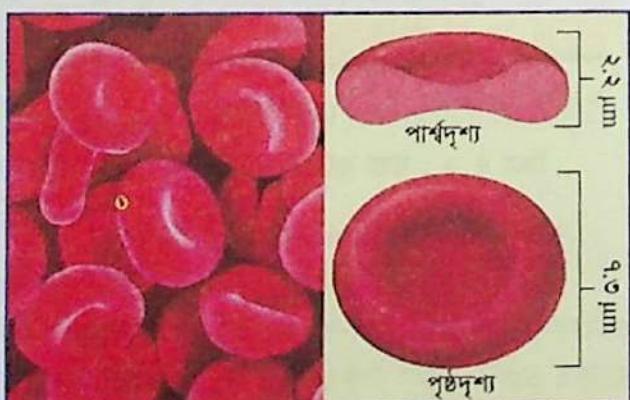


### ১. লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট (Erythrocyte; গ্রিক, erythros = লোহিত + kyios = কোষ)

মানবদেহের রক্তরসে ভাসমান গোল, ধী-অবতল চাকতির মতো, **নিউক্লিয়াসবিহীন** কিন্তু অক্সিজেনবাহী হিমোগ্লোবিনযুক্ত, লাল বর্ণের কণিকাকে লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood Corpuscles, RBC) বলে। এ ধরনের কণিকার গড় ব্যাস  $7.3 \mu\text{m}$  ও গড় স্থূলতা  $2.2 \mu\text{m}$  এবং কিনারা অপেক্ষা মধ্যভাগ অনেক পাতলা। স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মধ্যে কেবল উটের লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে-এ তথ্যটি নিয়ে সন্দেহ আছে।

বিভিন্ন বয়সের মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে রক্তকণিকার সংখ্যা হচ্ছে: জনদেহে ৮০-৯০ লাখ; শিশুর দেহে ৬০-৭০ লাখ; পূর্ণবয়স্ক পুরুষে ৫০-৫৪ লাখ; পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীদেহে ৪৪-৪৯ লাখ। বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় এ সংখ্যার তারতম্য ঘটে, যেমন- ব্যায়াম ও গর্ভাবস্থায় কণিকার সংখ্যা বেশি হয়। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ৫০ লাখের চেয়ে ২৫% কম হলে রক্তাঙ্কতা (anaemia) দেখা দেয়। কিন্তু এ সংখ্যা কোনো কারণে ৬৫ লাখের বেশি হলে তাকে পলিসাইথেমিয়া (polycythemia) বলে। লোহিত কণিকার আয়ুকাল ১২০ দিন।

লাল অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ (stem cell) থেকে লোহিত রক্তকণিকা উদ্ভৃত হয়। রক্তে অক্সিজেন মাত্রা কমে গেলে নতুন লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়। রক্তপাত, উচু স্থানে অবস্থান, ব্যায়াম, অস্থিমজ্জার ক্ষতি, কম মাত্রার হিমোগ্লোবিনসহ বিভিন্ন কারণে অক্সিজেন মাত্রা কমে যেতে পারে। বৃক্ক কম অক্সিজেন মাত্রা শনাক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে এরিথ্রোপয়েটিন (erythropoietin) নামে এক হরমোন উৎপন্ন ও ক্ষরণ করে। এ হরমোন লাল অস্থিমজ্জার মাধ্যমে লোহিত কণিকা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে উদ্বৃত্ত করে। বেশি লোহিত রক্তকণিকা রক্তপ্রবাহে যুক্ত হলে রক্ত ও টিস্যুতে অক্সিজেনের মাত্রাও বেড়ে যায়। রক্তে অক্সিজেন মাত্রা বৃদ্ধি পেলে



চিত্র ৪.৩ : লোহিত রক্তকণিকা

বৃক্ষ এরিথ্রোপয়েটিন ক্ষরণ করিয়ে দেয়, ফলে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদনও কমে যায়। **এরিথ্রোপয়েসিস (erythropoiesis)** বলে।

**MAT: ১৭-১৮**  
রাসায়নিকভাবে লোহিত কণিকার ৬০-৭০% পানি এবং ৩০-৪০% কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে প্রায় ৯০% হিমোগ্লোবিন। অবশিষ্ট ১০% প্রোটিন, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, অজৈব লবণ, অজৈব ফসফেট, পটাসিয়াম ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণু হিম (heme) নামক লৌহ ধারণকারী রঞ্জক (pigment) এবং গ্লোবিন (globin) নামক প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে প্রায় ১৬ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। হিমোগ্লোবিনের চারটি পলিপেপটাইড চেইনের সাথে একটি হিম গ্রুপ যুক্ত থাকে। হিম গ্রুপের জন্যই রক্ত লাল হয়।



চিত্র ৪.৪ : মানুষের রক্তের উপাদান (চিরানুগ)

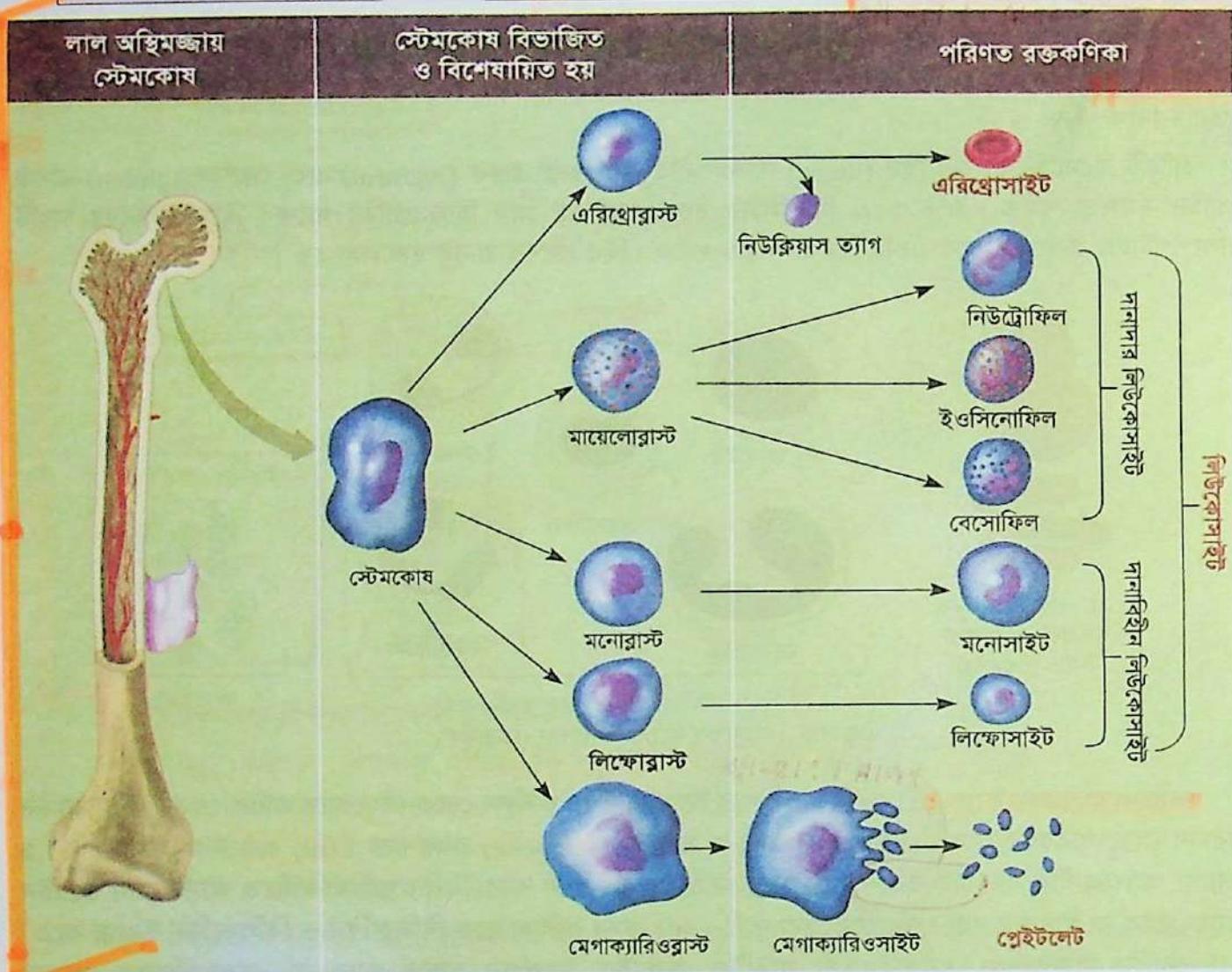
**MAT: ১২-১৩**

**লোহিত কণিকার কাজ** (i) লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে দেহকোষে অধিকাংশ  $O_2$  এবং সামান্য পরিমাণ  $CO_2$  পরিবহন করে। (ii) রক্তের ঘনত্ব ও সান্দুতা (viscosity) রক্ষা করে। (iii) এগুলোর হিমোগ্লোবিন ও অন্যান্য অস্তঁকোষীয় বস্তু বাফারজলে রক্তে অমৃত-কারের সাম্য রক্ষা করে। (iv) প্রাজমাবিলিতে অ্যান্টিজেন প্রোটিন সংযুক্ত থাকে যা মানুষের রক্ত গ্রহণয়ের জন্য দায়ী। (v) এসব কণিকা রক্তে বিলিৰুবিন ও বিলিভার্ডিন উৎপন্ন করে। (vi) লোহিত রক্তকণিকা এনজাইমসমূহ নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন করতে পারে যা এন্ডোথেলিয়াল কোষের L-arginine-এর মতো ব্যবহৃত হয়। (vii) এরা হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপাদন করে যা রক্তনালির সঙ্কোচনের জন্য সংকেত প্রদান করে। (viii) এরা অনেকসময় দেহের অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান (immune response) করে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন থেকে এক ধরনের মুক্ত আয়ন সৃষ্টি হয় যা জীবাণুর কোষপ্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে একে ধ্বংস করে।

## ২. শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট (Leucocyte; গ্রিক, *leucos* = বর্ণহীন, + *kytos* = কোষ)

মানবদেহের পরিণত শ্বেত কণিকা হিমোগ্লোবিনিহীন, অনিয়তাকার ও নিউক্লিয়াসযুক্ত বড় কোষ। কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না বলে এগুলোকে শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Corpuscles, WBC) নামে ডাকা হয় (প্রকৃত পক্ষে বর্ণহীন)। এ রক্তকণিকাকে দেহের ভ্রাম্যমান প্রতিরক্ষাকারী একক (mobile defensive unit) বলে কারণ এগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে। মানুষের শ্বেত রক্তকণিকা নির্দিষ্ট আকারবিহীন। প্রয়োজনে আকার পরিবর্তিত হয়। নিউক্লিয়াস প্রথমে গোল বা ডিম্বাকার হয় কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে বৃক্ষাকার ও অশ্঵ক্ষুরাকার ধারণ করে। নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের চাপে একপ্রাণ্তে অবস্থান নেয়। এগুলো লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে বড়। মানবদেহের প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে ৪-১১ হাজার (গড়ে ৭৫০০) শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানবদেহে সংখ্যা বেড়ে যায়। লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকার গড় অনুপাত আনুমানিক ৬০০ : ১।

### নিচের ছবিতে লাল অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ থেকে রক্তকণিকার উৎপত্তি দেখানো হলো



চিত্র ৪.৫ : বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকার উৎপত্তি

→ DAT: 18-19

রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে তাকে লিউকোসাইটোসিস (leukocytosis) এবং কম থাকলে তাকে লিউকোপেনিয়া (leukopenia) বলে। রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা কম থাকলে দুর্বল অনাক্রম্যতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। লিউকেমিয়া (leukemia) ক্যানসারের ক্ষেত্রে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় এবং রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিও-প্রোটিনসমূহ এবং গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, অ্যাসক্রিবিক এসিড ও বিভিন্ন প্রোটোলাইটিক এনজাইম বহন করে।

আকৃতি ও গঠনগতভাবে শ্বেত রক্তকণিকাকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-ক. দানাবিহীন বা অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট (agranulocytes) এবং খ. দানাদার বা গ্র্যানিউলোসাইট (granulocytes)।

ক. দানাবিহীন বা অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট (Agranulocyte) : এ ধরনের লিউকোসাইটে সাইটোপ্লাজম দানাহীন, স্বচ্ছ এবং নিউক্লিয়াসটি বড় ও অখণ্ডায়িত। এটি আবার নিম্নোক্ত দু'রকম -

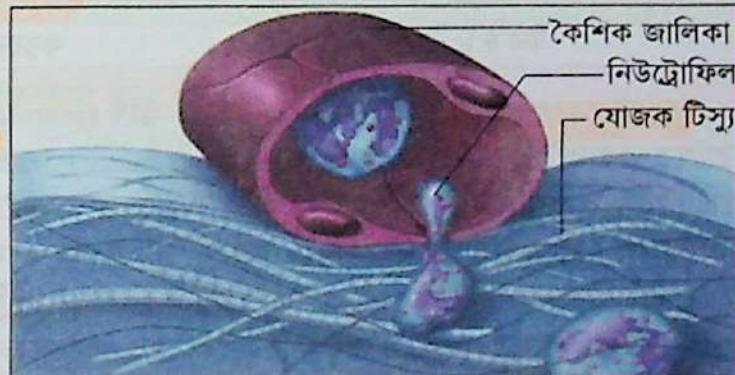
- i. **মনোসাইট (Monocyte) :** মনোসাইটে অপেক্ষাকৃত ছোট নিউক্লিয়াসটি প্রাথমিক অবস্থায় গোলাকার অথবা ডিম্বাকার থাকে এবং বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কের মতো অথবা ঘোড়ার ক্ষুরের মতো দেখায়। এতে সাইটোপ্লাজম বেশি থাকে। এদের ব্যাস ১২-২০ মাইক্রোমিটার এবং আয়ুকাল ২-৫ দিন। দেহের ২-৮% শ্বেতকণিকা মনোসাইট। এগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে রোগ জীবাণু ভক্ষণ করে রোগ আক্রমণ প্রতিহত করে।
- ii. **লিফ্ফোসাইট (Lymphocyte) :** লিফ্ফোসাইটে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৃহৎ আকৃতির গোলাকার, অখণ্ডায়িত একটি নিউক্লিয়াস এবং অপেক্ষাকৃত কম সাইটোপ্লাজম থাকে। এগুলোর ব্যাস ৬-১৬ মাইক্রোমিটার, সাইটোপ্লাজম স্বচ্ছ, দানাবিহীন ও ক্ষরাসক্ত এবং আয়ুকাল প্রায় ৭ দিন। কাজের ধরণ ও এদের কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী লিফ্ফোসাইট তিন ধরনের, যথা: T-কোষ, B-কোষ ও ন্যাচারাল কিলার কোষ বা N.K. Cell (দশম অধ্যায়ে এদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে)। এটি অ্যান্টিবডি উৎপন্ন এবং কিছু অণুজীব ধ্বংস করে। দেহের ২০-৪০% শ্বেত কণিকা লিফ্ফোসাইট। এগুলো লসিকাতন্ত্রে সৃষ্টি হয়। অন্যান্য লিউকোসাইটের মতো এরা ফ্যাগোসাইট নয়।



চিত্র ৪.৬ : বিভিন্ন ধরনের লিউকোসাইট

৩. দানাদার বা গ্র্যানিউলোসাইট (Granulocytes) : এ ধরনের লিউকোসাইটে **সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত** এবং নিউক্লিয়াসটি ছোট ও খণ্ডকযুক্ত। দানাগুলো লিশম্যান রঞ্জকে নানাভাবে রঞ্জিত হয়। বর্ণধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কণিকাগুলোকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

- i. **নিউক্লিয়াফিল (Neutrophil) :** সংগ্রালনরত রক্তের ৪০-৬০% হলো নিউক্লিয়াফিল। এসব কোষের সাইটোপ্লাজম বর্ণ নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম দানাময়, নিউক্লিয়াস ২-৫টি খণ্ডক যুক্ত। এগুলোর ব্যাস ১২-১৫ মাইক্রোমিটার এবং আয়ুকাল ২-৫ দিন। ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে রোগজীবাণু (ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক) ভক্ষণ করে রোগ আক্রমণ প্রতিহত করে। নিউক্লিয়াফিল অ্যামিবয়েড চলনে সক্ষম এবং সঙ্কুচিত হয়ে কৈশিক জালিকা প্রাচীরে কণিকার চেয়ে ছোট ছিদ্র ভেদ করে টিস্যুতে ও সংক্রমণ স্থলে উপস্থিত হতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে ডায়াপেডেসিস (diapedesis) বলে।



চিত্র ৪.৭ : কৈশিক জালিকা ভেদ করে নিউক্লিয়াফিলের টিস্যুতে প্রবেশ সঙ্কুচিত হয়ে কৈশিক জালিকা প্রাচীরে কণিকার চেয়ে ছোট ছিদ্র ভেদ করে টিস্যুতে ও সংক্রমণ স্থলে উপস্থিত হতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে ডায়াপেডেসিস (diapedesis) বলে।

- ii. **ইওসিনোফিল (Eosinophil) :** রক্তের স্বাভাবিক অবস্থায় এদের সংখ্যা ২-৪%। এসব কোষের সাইটোপ্লাজম দানাময়, অস্থুধর্মী। দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে লাল বর্ণ ধারণ করে। নিউক্লিয়াস সাধারণত ২ খণ্ডকযুক্ত হয়। এদের ব্যাস ১২-১৭ মাইক্রোমিটার এবং আয়ুকাল ৮-১২ দিন। এরা দেহের অ্যালার্জির বিরুদ্ধে কাজ করে। অ্যালার্জি, পরজীবীর সংক্রমণ, পীথা ও স্নায়ুতন্ত্রের রোগের কারণে রক্তে ইওসিনোফিলের সংখ্যা বেড়ে যায়।

iii. বেসোফিল (Basophil) : শ্বেত কণিকার সবচেয়ে কম অংশ (০.৫-১%) বেসোফিল ধরনের। এসব কোষের সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত ও অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষারধর্মী। এগুলো ক্ষারাসক্ত হয়ে **নীল বর্ণ** ধারণ করে। এদের নিউক্লিয়াস দুই খঙ্গ যুক্ত এবং বৃক্কাকার। এদের ব্যাস ১২-১৫ মাইক্রোমিটার এবং আয়ুকাল ১২-১৫ দিন। বেসোফিল হিস্টামিন (histamine) নিঃসরণ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং **হেপারিন** (heparin) নিঃসরণ করে রক্তকে রক্তনালির মধ্যে জমা বাঁধতে বাধা প্রদান করে।

**শ্বেত রক্তকণিকার কাজ :** (i) মনোসাইট ও নিউট্রোফিল **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে ধ্বংস করে। (ii) লিফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে (এজন্য এদের আণুবীক্ষণিক সৈনিক বলে)। (iii) বেসোফিল হেপারিন (heparin) উৎপন্ন করে যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্তজমাট রোধ করে। (iv) দানাদার লিউকোসাইট হিস্টামিন (histamine) সৃষ্টি করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। (v) নিউট্রোফিলের বিষাক্ত দানা জীবাণু ধ্বংস করে। (vi) ইওসিনোফিল রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা এবং অ্যালার্জিক অ্যান্টিবডি ধ্বংস করে।

### ৩. অণুচক্রিকা বা প্লেইটলেট (Platelets) বা থ্রোম্বোসাইট (Thrombocytes)

দেহের লাল অস্থিমজ্জার মেগাক্যারিওসাইট (megakaryocyte) নামে বড় কোষ থেকে উৎপন্ন ও রক্তরসে ভাসমান  $1-8\mu\text{m}$  ব্যাসসম্পন্ন, অনিয়তাকার, ঝিল্লি-আবৃত, সামান্য সাইটোপ্লাজমযুক্ত কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন, কোষ-ভগ্নাংশকে (cell fragments) অণুচক্রিকা বা প্লেইটলেট বলে। প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে প্রায়  $1,50,000-8,00,000$  অণুচক্রিকা থাকতে পারে। প্রতিদিন প্রায় ২০০ বিলিয়ন (২০ হাজার কোটি) অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়। রক্তস্ন্তানে প্রবেশের পর এদের জীবনকাল ৫-৯ দিন। যুক্ত ও পুরীহার ম্যাক্রোফেজের মাধ্যমে এদের ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে।



চিত্র ৪.৮ : অণুচক্রিকা

অণুচক্রিকার শুধু সাইটোপ্লাজমই নয় ঝিল্লি ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। **ঝিল্লিতে অবস্থিত গ্লাইকোপ্রোটিন** রক্তবাহিকার ক্ষতস্থানে বিশেষ করে এন্ডোথেলিয়ামে যুক্ত হয় এবং ঝিল্লি থেকে বিপুল পরিমাণ ফসফোলিপিড নির্গত হয়ে রক্ত জমাটের বিভিন্ন ধাপ ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হয়।

**অণুচক্রিকার কাজ :** (i) অস্থায়ী প্লেইটলেট প্লাগ (platelet plug) সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ করে। (ii) রক্তজমাট ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন ক্লটিং ফ্যাক্টর (clotting factor) ক্ষরণ করে। (iii) প্রয়োজন শেষে রক্তজমাট বিগলনে সাহায্য করে। (iv) ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ধ্বংস করে। (v) দেহের কোথাও ব্যথার সৃষ্টি হলে নিউট্রোফিল ও মনোসাইটকে আকৃষ্ট করতে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। (vi) রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়ামের অস্থপ্রাচীর সুরক্ষার জন্য ফ্রোথ-ফ্যাক্টর ক্ষরণ করে। (vii) **সেরোটোনিন** (serotonin) নামক রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে রক্তবাহিকাকে দ্রুত সংকেচনে উদ্বৃদ্ধ করে। (viii) স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি অণুচক্রিকা থাকলে রক্তনালির ভিতরে অদরকারী রক্তজমাট সৃষ্টি, স্ট্রেক ও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

রক্ত কণিকাগুলোকে রক্তকোষ বলা হয় না। কারণ-

NAT:19-20

লোহিত কণিকার অধিকাংশ রক্ত কণিকায় প্রয়োজনীয় কোষঅঙ্গগুলি থাকে না, যেমন- **নিউক্লিয়াস**, **সেন্ট্রিওল**, **মাইটোকলিয়া**, গলজি বডি ইত্যাদি কোষাংশ নেই। শ্বেতকণিকা ও অণুচক্রিকাতেও অনেক কোষ অঙ্গগুলি অনুপস্থিত থাকে। তাছাড়া রক্ত কণিকাগুলো বিভাজিত হয়ে নতুন রক্ত কণিকা তৈরি করতে পারে না। এগুলো মূলত অস্থি মজ্জার স্টেমকোষ থেকে উৎপন্ন হয় এবং ঘন সংবন্ধ হয়ে অভিন্ন স্তর সৃষ্টির পরিবর্তে তরল মাত্কায় ভেসে বেড়ায়। তাই রক্ত কণিকাগুলোকে রক্তকোষ বলা হয় না।

**মানবদেহের রক্তের বিভিন্ন রক্তকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো**

রক্তকণিকা	প্রকারভেদ	সংখ্যা (প্রতি ঘন মিলি রক্তে)	উৎসস্থল	গঠন বৈশিষ্ট্য	কাজ	আযুক্তি
লোহিত রক্তকণিকা	—	পুরুষে ৫০ লক্ষ স্ত্রীতে ৪৫ লক্ষ	জ্বরাবস্থায় যকৃত ও পুরী এবং জন্মের পর লাল অস্থিমজ্জা।	গোলাকার, দ্বি-অবতল, পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিউক্লিয়াস বিহীন; গড় ব্যাস $7.3\mu\text{m}$ ও স্থূলতা $2.2\mu\text{m}$ .	(i) $\text{O}_2$ ও $\text{CO}_2$ বহন করা। (ii) অম্ল ও ফ্যারের সমতা রক্ষা করা।	১২০ দিন
শ্বেত রক্তকণিকা	(i) নিউট্রোফিল	৩-৫ হাজার	লাল অস্থিমজ্জা	সাইটোপ্লাজম দানাময়, নিউক্লিয়াস ২-৫ খন্ড বিশিষ্ট। ব্যাস $12\mu\text{m}$ - $15\mu\text{m}$ .	ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধৰ্মস করা।	২-৫ দিন
	(ii) ইওসিনোফিল	১৫০-৮০০	লাল অস্থিমজ্জা	সাইটোপ্লাজম দানাময়, নিউক্লিয়াস ২-৭ খন্ড বিশিষ্ট। ব্যাস $12\mu\text{m}$ - $17\mu\text{m}$ .	অ্যালার্জি প্রতিরোধে সাহায্য করে।	৮-১২ দিন
	(iii) বেসোফিল	২৫ - ২০০	লাল অস্থিমজ্জা	দানাযুক্ত সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস বৃক্ষাকার। ব্যাস $12\mu\text{m}$ - $15\mu\text{m}$ .	হেপারিন ও হিস্টোমিন নিঃস্তৃত করে রক্তকে রক্ত বাহিকার ভিতর জমাট বাঁধতে বাঁধা দেয়।	১২-১৫ দিন
	(iv) লিফোসাইট	১৫০০-২৭০০	পুরী, লসিকা গ্রাহ্ণ, লাল অস্থিমজ্জা।	দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, প্রায় গোলাকার, বৃহদাকার নিউক্লিয়াস। ব্যাস $6\mu\text{m}$ - $16\mu\text{m}$ .	অ্যান্টিবিডি উৎপন্ন করে।	প্রয় ৭ দিন
	(v) মনোসাইট	৩০০-৮০০	পুরী, লসিকা, গ্রাহ্ণ, লাল অস্থিমজ্জা।	দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, বৃক্ষাকার নিউক্লিয়াস। ব্যাস $12\mu\text{m}$ - $20\mu\text{m}$ .	ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণু ধৰ্মস করে।	২-৫ দিন
অণুচক্রিকা	—	১.৫ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ	লাল অস্থিমজ্জা	গোল, ডিম্বাকার বা রাডের মতো, দানাময় কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন। $1\mu\text{m}$ - $8\mu\text{m}$ ব্যাসবিশিষ্ট।	রক্তজমাটে সহায়তা করে।	৫-৯ দিন।

**লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকার মধ্যে পার্থক্য**

তুলনীয় বিষয়	লোহিত রক্তকণিকা	শ্বেত রক্তকণিকা	অণুচক্রিকা
সংখ্যা	১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৪৫-৫০ লক্ষ।	১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৫-৮ হাজার।	১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ১.৫ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ।
নিউক্লিয়াস	২. প্রাথমিকভাবে নিউক্লিয়াস থাকলেও হিমোগ্লোবিন সংপ্রতিত হবার পর নিউক্লিয়াস বিনষ্ট হয়ে যায়।	২. সব সময় নিউক্লিয়াস থাকে।	২. কোনো সময়ই নিউক্লিয়াস থাকে না।
বর্ণ	৩. সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন থাকায় এগুলোকে লাল বর্ণের দেখায়।	৩. সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন না থাকায় এগুলো বর্ণহীন।	৩. বর্ণহীন।
আযুক্তি	৪. ১২০ দিন।	৪. ২-১৫ দিন।	৪. ৫-৯ দিন।
আকৃতি	৫. দ্বি-অবতল, চাকতির মতো।	৫. গোলাকার বা অনিয়ত।	৫. অনিয়ত আকৃতির।
কাজ	৬. $\text{O}_2$ পরিবহন।	৬. রোগ প্রতিরোধ।	৬. রক্ত তরঙ্গন।

### রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ত তঞ্চন (Blood Clotting)

মানবদেহে রক্তবাহিকার অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধতে পারেনা কারণ বাহিকার অন্তঃস্থ প্রাচীর থাকে মসৃণ এবং রক্তে হেপারিন (heparin) নামে এক ধরনের মিউকোপলিস্যাকারাইডের সংবহন। দেহের কোথাও ক্ষত সৃষ্টির ফলে কোনো রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তপাত বক্রের উদ্দেশে ও সংক্রমণ প্রতিরোধে যে জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফাইব্রিন জালক সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতস্থানে রক্তকে থকথকে পিণ্ডে পরিণত করে সে প্রক্রিয়াকে রক্তের জমাট বাঁধা বা রক্ত তঞ্চন বলে। এ প্রক্রিয়ায় অগুচ্ছকিকা ও রক্তরসে অবস্থিত ১৩ ধরনের ক্লটিং ফ্যাক্টর (clotting factor) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ৪টি ফ্যাক্টর হলো— (i) ফাইব্রিনোজেন, (ii) প্রোথ্রুমিন, (iii) থ্রুমোপ্লাস্টিন ও (iv)  $\text{Ca}^{2+}$ । DAT: 20-21, 19-20, 17-18, 16-17

নিচে ফ্যাক্টরগুলোর নাম ও রক্ত তঞ্চনে ভূমিকা উল্লেখ করা হলো

ফ্যাক্টর	তঞ্চনে ভূমিকা
১. ফ্যাক্টর-১ বা ফাইব্রিনোজেন	এটি গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিন। তঞ্চনের সময় ফাইব্রিনে পরিণত হয়।
২. ফ্যাক্টর-১১ বা প্রোথ্রুমিন	এটি প্রাজমা প্রোটিন। ভিটামিন K-র উপস্থিতিতে যকৃতে সংশ্লেষিত হয়। তঞ্চনের সময়ে থ্রুমিনে পরিণত হয়।
৩. ফ্যাক্টর-৩ বা থ্রুমোপ্লাস্টিন	এটি বিনষ্ট টিস্যুকোষ বা ভাঙা অগুচ্ছকিকা থেকে নিঃসৃত হয়। এটি ক্যালসিয়াম আয়নের সহায়তায় প্রোথ্রুমিনকে থ্রুমিনে পরিণত করে।
৪. ফ্যাক্টর-৪ বা ক্যালসিয়াম	ক্যালসিয়াম আয়ন একাধারে থ্রুমোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে এবং অপর-দিকে প্রোথ্রুমিনকে থ্রুমিনে পরিণত করে।
৫. ফ্যাক্টর-৫ বা ল্যাবাইল ফ্যাক্টর বা প্রোঅ্যাকসেলারিন	প্রাজমায় অবস্থিত প্রোটিন জাতীয় এ পদার্থটি প্রোথ্রুমিনকে থ্রুমিনে পরিণত করে।
৬. ফ্যাক্টর-৬ বা অ্যাকসেলারিন	এটি প্রকল্পিত।
৭. ফ্যাক্টর-৭ বা স্টেবল ফ্যাক্টর বা প্রোকনভারচিন	প্রাজমায় অবস্থিত এ প্রোটিনটি থ্রুমোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে।
৮. ফ্যাক্টর-৮ বা অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর (AHF)	এটি প্রাজমায় থাকে এবং থ্রুমোপ্লাস্টিন সৃষ্টিতে সাহায্য করে।
৯. ফ্যাক্টর-৯ বা ক্রিস্টামাস ফ্যাক্টর	এটি প্রাজমায় থাকে এবং থ্রুমোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে।
১০. ফ্যাক্টর-১০ বা স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর	এর রাসায়নিক উপাদান ফ্যাক্টর-VII এর মতো। এর অভাবে রক্ত তঞ্চন ব্যাহত হয়।
১১. ফ্যাক্টর-১১ বা প্রাজমা থ্রুমোপ্লাস্টিন	রক্তরসে অবস্থিত প্রোটিন, থ্রুমোপ্লাস্টিন গঠনে অংশ নেয়।
১২. ফ্যাক্টর-১২ বা হ্যাগম্যান ফ্যাক্টর	রক্তরসে অবস্থিত এ ফ্যাক্টর ক্যালিক্রেইনকে (Kallikrein) সক্রিয় করে এবং প্রাজমাকাইনিন (Plasmakinin) নামক পদার্থ সৃষ্টি করে রক্তনালিক ভেদ্যতা ও সম্প্রসারণশীলতা বাড়ায়।
১৩. ফ্যাক্টর-১৩ বা ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর	এটি ক্যালসিয়াম আয়নের সহযোগিতায় রক্তের নরম তঞ্চন পিণ্ডকে অন্দুরণীয় কঠিন তস্তুতে রূপান্তরিত করে।

### রক্ত তঞ্চন পদ্ধতি (Mechanism of Blood Clotting)

দেহের শারীরবৃত্তিক স্থিতাবস্থার জন্য রক্তবাহিকায় রক্তরস, রক্তকণিকা ইত্যাদির নির্বিঘ্ন প্রবাহ অঙ্কুর রাখতে রক্তের জমাট বাঁধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষত নিরাময়ের উদ্দেশে যে কোনো উপায়ে রক্তপাত মন্তব্য ও বক্রের প্রক্রিয়াকে হিমোস্ট্যাসিস (hemostasis) বলে। মানবদেহে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াটি ও হিমোস্ট্যাসিসের অংশ।

নিচে বর্ণিত কয়েকটি ধারাবাহিক জৈব রাসায়নিক ধাপের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১. দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে বা বিনষ্ট হলে সে স্থানের টিস্যু থেকে রক্ত বেরিয়ে যখন বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখন হেপারিন নিষ্ক্রিয় হয়, **থ্রোসাইট (অণুচক্রিকা)** বিদীর্ণ হয় এবং তা থেকে থ্রোপ্লাস্টিন (এক ধরনের লিপোপ্রোটিন) নামক এনজাইম বেরিয়ে রক্তরসে চলে আসে।

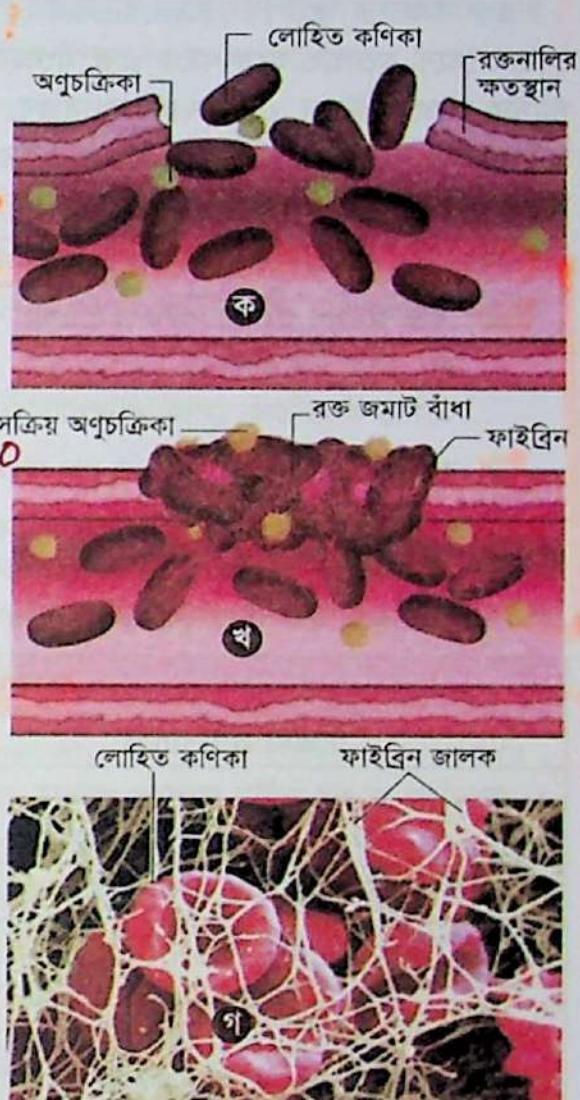
২. থ্রোপ্লাস্টিন রক্তরসের ক্যালসিয়াম আয়নের ( $\text{Ca}^{2+}$ ) সহায়তায় রক্তরসের নিষ্ক্রিয় প্রোথ্রিন এনজাইমকে সক্রিয় **থ্রিন** এ পরিণত করে।

MAT:09-10

৩. সক্রিয় থ্রিন রক্তরসের ফাইব্রিনোজেন প্রোটিনকে প্রথমে চিকন সূতার মতো ফাইব্রিন ঘনোমার-এ পরিণত করে। ফাইব্রিন সূত্রকগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে জালকের মতো ফাইব্রিন পলিমার গঠন করে। একে রক্ত জমাট বাঁধানোর কাঠামো/কক্ষাল বলে।

৪. ফাইব্রিন জালকের মধ্য দিয়ে রক্ত নির্গত হওয়ার সময় লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, রক্তের তরল অংশ এবং অন্যান্য উপাদান আটকে যায়। ফলে রক্ত জমাট বাঁধে, আর রক্তক্ষরণ হয় না। লোহিত কণিকা আটকে যাওয়ায় জমাটটি লালচে দেখায়।

জমাট বাঁধা শেষ হলে জমাট থেকে যে হলুদ তরল বেরিয়ে আসে তা সিরাম (serum)। সিরামের গঠন রক্তরসের মতোই তবে এতে ফাইব্রিনোজেন ও প্রোথ্রিন থাকে না। ফাইব্রিন জমাট সাময়িক। রক্তবাহিকার পুনর্গঠন শুরু হলে নতুন টিস্যুকোষ সৃষ্টির জন্য প্লাজমিন (plasmin) এনজাইম ফাইব্রিন জালককে ধ্বংস করে দেয়।



চিত্র ৪.৯ : রক্ত জমাট বাঁধা

**ধাপ-১** বিনষ্ট অণুচক্রিকা  
ও টিস্যুকোবজাত  
উপাদান  $\xrightarrow{\text{রক্তরসের তথ্যন সহায়ক উপাদান}}$  থ্রোপ্লাস্টিন

**ধাপ-২** প্রোথ্রিন (নিষ্ক্রিয়)  $\xrightarrow{\text{থ্রোপ্লাস্টিন}}$  থ্রিন (সক্রিয়)

**ধাপ-৩** ফাইব্রিনোজেন  $\xrightarrow{\text{থ্রিন}}$  ফাইব্রিন মনোমার

**ধাপ-৪** ফাইব্রিন জালক  $\xrightarrow{\text{পরস্পরের সাথে সংযোজন}}$  ফাইব্রিন পলিমার  
রক্তকণিকা আবন্ধকরণ

তথ্যন পিণ্ড  
(রক্ত জমাট বাঁধা)

চিত্র ৪.১০ : রক্ত তথ্যন প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত সার

**রক্ততঞ্চলকাল :** দেহ থেকে নির্গত রক্ত জমাট বাঁধতে যে সময় লাগে তাকে রক্ততঞ্চলকাল বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের **রক্ততঞ্চলকাল** হচ্ছে ৩-৮ মিনিট। তবে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে সময় আরও বেশি লাগতে পারে।

**রক্তক্ষরণকাল :** কোনো বাহ্যিক প্রয়োগ ছাড়া প্রথম রক্ত নির্গত হওয়া শুরু থেকে রক্ত জমাট বাঁধা পর্যন্ত সময়কে রক্তক্ষরণকাল ১-৪ মিনিট।

MAT

**রক্ত তক্ষনের তাৎপর্য** (Significance of Blood Clotting) : দেহের কেন্দ্র অংশের রক্তবাহিকা কেটে গেলে সেখান থেকে রক্তপাত হতে থাকে এবং সংবহনতন্ত্রে রক্তের আয়তন কমে যায়। রক্ত প্রাণিদেহে খাদ্যবস্তুর সরবরাহ, গ্যাসীয় বস্তুর পরিবহন, রেচন বস্তুর অপসারণ, হরমোন বহন এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই দেহে রক্তের পরিমাণ কমে গেলে নানারকম শারীরবৃত্তীয় সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি প্রাণীর মৃত্যুও হতে পারে। রক্ত তক্ষন প্রক্রিয়া ছিল রক্তবাহিকা থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে সেই সব সম্ভাবনা রোধ করে।

### রক্তনালির ভিতরে সাধারণত **রক্ত তক্ষন হয় না** কারণ- → MAT: 09-10

- রক্ত অমসৃণ তল বা বিনষ্ট টিস্যুকোষ বা বাতাসের সংস্পর্শে এলে রক্তের অণুচক্রিকা ভেঙ্গে থ্রোপ্লাস্টিন তৈরি হয়, ফলে রক্ত তক্ষনের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু রক্তনালির অন্তর্গাত্র মসৃণ হওয়ায় এবং রক্ত বাতাসের সংস্পর্শে না আসায় অণুচক্রিকা থেকে থ্রোপ্লাস্টিন উৎপন্ন হয় না, ফলে রক্ত তক্ষনের সূত্রপাতও ঘটেনা।
- রক্তনালির ভিতর রক্তের গতি রক্ত তক্ষনের সহায়ক নয়।
- রক্তে হেপারিন নামক একধরনের তক্ষন নিরোধক পদার্থ বা অ্যান্টিকোয়াঙ্গুল্যান্ট (anticoagulant) থাকে। হেপারিন রক্তের বেসোফিল ও যোজক টিস্যুর মাস্টকোষ থেকে নিঃসৃত হয়। হেপারিন প্রোথ্রিনের উৎপাদনে বাধা দিয়ে রক্ত তক্ষন রোধ করে।

### প্লাজমা ও সিরামের মধ্যে পার্থক্য

প্লাজমা (Plasma)	সিরাম (Serum)
১. স্বাভাবিক রক্তের জলীয় অংশকে প্লাজমা বলে।	১. তধিত রক্তের তক্ষন পিণ্ড থেকে নিঃসৃত জলীয় অংশকে সিরাম বলে।
২. এতে বিভিন্ন প্রকার রক্ত কণিকা থাকে।	২. এতে রক্ত কণিকা থাকে না।
৩. এতে ফাইব্রিনোজেন থাকে।	৩. এতে ফাইব্রিনোজেন থাকে না।
৪. এর তক্ষন ধর্ম উপস্থিতি।	৪. এর তক্ষন ধর্ম অনুপস্থিতি।
৫. রক্তবাহিকার গহ্বর ও হৃৎপ্রকোষ্ঠে অবস্থান করে।	৫. সাধারণ অবস্থায় দেহের মধ্যে থাকে না।

### লসিকা বা লিম্ফ (Lymph)

চিস্যু গঠনকারী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত বণ্হীন তরল পদার্থকে লসিকা (lymph; ল্যাটিন, *lympha* = clear water) বলে। পরিণত মানবদেহে প্রতিদিন কৈশিকজালিকার প্রাচীর ভেদ করে ৪-৮ লিটার তরল পদার্থ ও রক্তপ্রোটিন চারপাশের চিস্যু কোষের ফাঁকে ফাঁকে লসিকা হিসেবে অবস্থান করে। লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে শুধু লসিকা নয় রক্তপ্রোটিনও রক্তে ফিরে যায়। রক্তপ্রোটিন যদি এভাবে পুনরুদ্ধার না হতো তাহলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মানুষ মারা যেতে।

**লসিকার উৎপত্তি** : ধমনির শাখা থেকে উৎপন্ন কৈশিক-ধমনিতে (arteriole) রক্ত পৌছালে এর অধিকাংশই কৈশিক-শিরাতে (venule) প্রবাহিত হয়। প্রায় ১০% এর মতো রক্তরস (প্লাজমা) কৈশিক জালিকা থেকে বেরিয়ে দেহ কোষের চারদিকে ইন্টারস্টিশিয়াল তরল (interstitial fluid) হিসেবে অবস্থান করে। এ তরল লসিকা নালিকায় প্রবেশ করে লসিকায় পরিণত হয়। লসিকা উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে লিম্ফোজেনেসিস (lymphogenesis) বলে।

**লসিকার উপাদান** : লসিকায় প্রধানত দুধরনের উপাদান দেখা যায়, যথা-কোষ উপাদান ও কোষবিহীন উপাদান।

**কোষ উপাদান** : লসিকায় প্রধানত শেত কণিকার লিম্ফোসাইট এবং কিছু মনোসাইট থাকে। প্রতি কিউবিক মিলিমিটার লসিকায় ৫০০-৭৫,০০০ লিম্ফোসাইট থাকতে পারে।

**কোষবিহীন উপাদান :** লসিকায় অবস্থিত কোষবিহীন উপাদানগুলো রক্তরসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লসিকায় প্রায় ৯৪%ই পানি এবং ৬% কঠিন পদার্থ বিদ্যমান। কঠিন অংশের মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো পাওয়া যায়:

১. **শর্করা :** প্রতি ১০০ মিলিলিটার লসিকায় শর্করার (গুকোজ) পরিমাণ ১২০-১৩২ গ্রাম।
২. **প্রোটিন :** লসিকায় প্রধানত অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি থাকে।
৩. **লিপিড :** প্রধানত কাইলোমাইক্রন হিসেবে থাকে যাতে ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফসফোলিপিড উপস্থিত। অভুক্ত অবস্থায় লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে। চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকা দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে কাইল (chyle) বলে। তবে সাধারণত এর পরিমাণ মোট কঠিন অংশের প্রায় ৫-১৫%।
৪. **রেচন বর্জ্য :** লসিকায় ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি পাওয়া যায়।
৫. **অন্যান্য বস্তু :** গুকোজ, জীবাণু, ক্যানসার কোষ, দ্রবীভূত  $\text{CO}_2$  ইত্যাদিও লসিকায় পাওয়া যায়।

### লসিকার কাজ

দেহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ লসিকার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেমন-

১. টিস্যুর ফাঁকা স্থান থেকে অধিকাংশ প্রোটিন লসিকার মাধ্যমে রক্তে ফিরে আসে।
২. যেসব স্নেহকণা ও উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট কণা কৈশিক নালির বাধা অতিক্রমে অক্ষম সেগুলো লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৩. দেহের যেসব টিস্যুকোষে রক্ত পৌছাতে সক্ষম হয় না সেখানে লসিকা অক্সিজেন ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে।
৪. অন্ত থেকে স্নেহ পদার্থ শোষিত হয়ে লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৫. লসিকায় উপস্থিত শ্বেত কণিকা (লিফোসাইট ও মনোসাইট) দেহের প্রতিরক্ষায় অবদান রাখে।
৬. লসিকা ও লিফোসাইট থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাঢ়ায়।
৭. লসিকা রক্ত সংবহনের এক অংশ থেকে অন্য অংশে তরল পদার্থ পরিবহনের মাধ্যমে দেহরসের পুনর্বন্টনে অংশ নেয়।
৮. বিভিন্ন অঙ্গে টিস্যুর সাংগঠনিক অখণ্ডতা রক্ষায় লসিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৯. টিস্যু থেকে টিস্যুরসের প্রায় ১০% অংশ লসিকার মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়।
১০. অপ্রয়োজনীয়  $\text{CO}_2$  ও বর্জ্য পদার্থ কোষ থেকে লসিকায় গৃহীত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হয়।

### লসিকাতন্ত্র (Lymphatic System)

লসিকানালি ও লসিকাগ্রস্থির সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র দেহে লসিকারস প্রবাহিত হয় তাকে লসিকাতন্ত্র বলে। ডেনিস বিজ্ঞানী Olaus Rudbeck এবং Thomas Bartholin, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম মানুষের লসিকাতন্ত্রের বিবরণ দেন। রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং লসিকাতন্ত্র উভয়েই সমগ্র দেহে ফ্লুইড (fluid) সংবহন করে বলে লসিকাতন্ত্রকে কখনো কখনো দ্বিতীয় সংবহনতন্ত্র বলেও অভিহিত করা হয়। লসিকাতন্ত্র প্রধান দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত, যথা- লসিকানালি ও লসিকাগ্রস্থি। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

#### ক. লসিকানালি (Lymph Vessels)

লসিকানালি বন্ধপ্রান্তবিশিষ্ট সূক্ষ্ম নালিকা। লসিকানালি দুধরনের, যথা-

১. **অন্তর্মুখী লসিকানালি :** এসব নালির মাধ্যমে লসিকা লসিকাগ্রস্থির দিকে পরিবাহিত হয়।
২. **বহিমুখী লসিকানালি :** এসব লসিকানালির মাধ্যমে লসিকাগ্রস্থি থেকে লসিকা রস অন্যত্র পরিবাহিত হয়।

মানুষের দেহের সকল লসিকানালি প্রধানত দুটি নালিতে মিলিত হয়। যথা:-

১. **ডান লসিকানালি :** মাথা ও গলার ডান দিক, ডান বাহু এবং বক্ষ অঞ্চলের ডান দিকে অবস্থিত লসিকানালিগুলো মিলে ডান লসিকানালি গঠন করে। এটি ডান সাবক্লেভিয়ান শিরা এবং ডান অন্তঃজুগুলার শিরার সংযোগস্থলে শিরাতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত।

২. **থোরাসিক লসিকানালি** : দেহের নিম্নাংশ এবং বাম দিকের লসিকানালিগুলো মিলে থোরাসিক লসিকানালি গঠন করে। এটি বাম সাবক্লেভিয়ান ও বাম অন্তঃজুগলার শিরার সংযোগস্থলে শিরাতত্ত্বের সাথে সংযুক্ত। পৌষ্টিকনালি অঞ্চলে লসিকানালি সুবিকশিত এবং নালি অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম লসিকানালিকে ল্যাকটিয়েল (lacteal) বলে। লসিকানালিতে শিরার অনুকূপ কপাটিকা থাকে তবে সংখ্যায় বেশি। ফলে লসিকা শুধু এক দিকে প্রবাহিত হয়। চলন বা শ্বসনের সময় কঙ্কাল পেশির সঙ্কোচনে লসিকানালিতে অত্যন্ত ধীর গতিতে লসিকা প্রবাহিত হয়। লসিকানালিতে ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া বা কোষের ধ্বংসাবশেষ (cell debris) প্রবেশ করতে পারে।

### ৩. লসিকাগ্রস্থি (Lymph Glands)

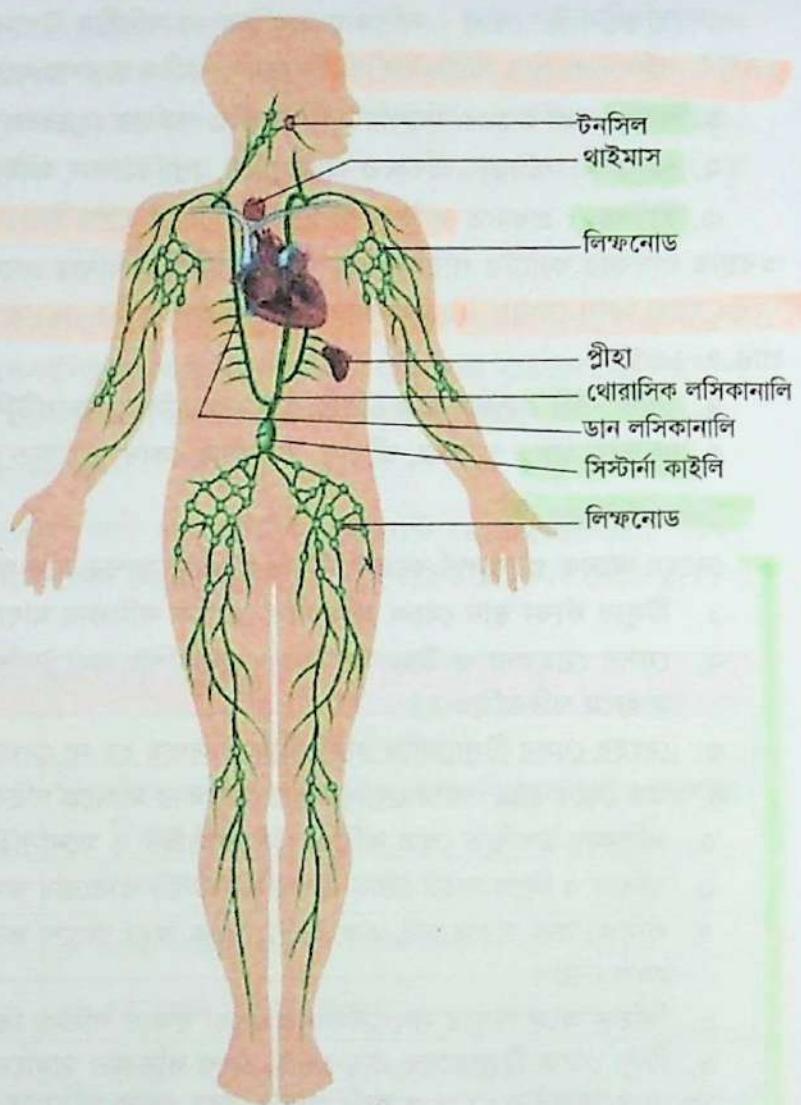
মানবদেহে **পাঁচ ধরনের লসিকাগ্রস্থি** পাওয়া যায়— লিফ্ফনোড, টনসিল, প্রীহা, থাইমাস ও লাল অস্থিমজ্জা। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

### লিফ্ফনোড (Lymph Node)

লিফ্ফনোড হচ্ছে লসিকা বাহিকায় অবস্থিত ক্যাপসুলের মতো অংশ। এগুলো শ্বেত রক্তকণিকা বিশেষ করে ম্যাক্রোফেজ ও লিফ্ফোসাইটে পূর্ণ থাকে এবং লসিকা থেকে অণুজীব ও বহিরাগত পদার্থ অপসারণ করে। লসিকা যখন রক্ত সংবহনতন্ত্রে ফিরে যায় তখন তা লিফ্ফনোডে পরিস্থৃত হয়। নোডগুলো যখন লসিকা পরিক্ষারে সক্রিয় থাকে তখন এর ভিতরে শ্বেত কণিকার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় এবং নোড নিজেও ফুলে-ফেঁপে উঠে। চিকিৎসার সময় পরীক্ষাকালে চিকিৎসক অনেক সময় রোগীর ঘাড়ে আলতোভাবে ছুঁয়ে লিফ্ফনোডগুলোর অবস্থাও বুঝে নেন।

### টনসিল (Tonsils)

মানবদেহে তিন ধরনের টনসিল রয়েছে— প্যালেটাইন, অ্যাডেনয়েড (বা ফ্যারিঙ্গিয়াল) ও লিঙ্গুল টনসিল। আমরা সাধারণতভাবে টনসিল বলতে প্রধানত প্যালেটাইন টনসিলকে বুঝি। মুখবিবরের পিছনে অর্থাৎ গলার প্রান্তে দুপাশে উদ্গত একটি করে ডিম্বাকার, কোমল টিস্যুনির্মিত, ছোট ছোট গর্তযুক্ত ও ফ্যাকাসে লালচে রঙের মিউকোসায় আবৃত লিফ অঙ্কে টনসিল বলে। অনেক সময় অণুজীব (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি) দমন করতে গিয়ে টনসিল নিজেই আক্রান্ত হয় কিংবা অতিরিক্ত ময়লায় ছিদ্রগুলো বক্ষ হলে টনসিলে সৃষ্টি প্রদাহকে টনসিলাইটিস (tonsillitis) বলে। এ টনসিলের কাজ হচ্ছে অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে লসিকায় প্রবেশিত বিভিন্ন অণুজীব ধ্বংস করে শ্বসন ও পরিপাকতন্ত্রের সুরক্ষা দেয়।



চিত্র ৪.১০ : মানুষের লসিকাতন্ত্র

কোনো কোনো মানুষ, বিশেষ করে অনেক শিশু ঘন ঘন টনসিলাইটিসে আক্রান্ত হয়। বামেলামুক্ত হওয়ার জন্য ব্যক্তি বা অভিভাবকেরা অপারেশনের মাধ্যমে টনসিল অপসারণকেই সঠিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করেন। অপারেশন করে টনসিল অপসারণকে টনসিলেকটমি (tonsillectomy) বলে। দেহের প্রতিরক্ষায় টনসিলের ভূমিকা উপলক্ষের পর বর্তমানে এ প্রক্রিয়া যথেষ্ট কমেছে।

### প্রীহা বা পীলা (Spleen)

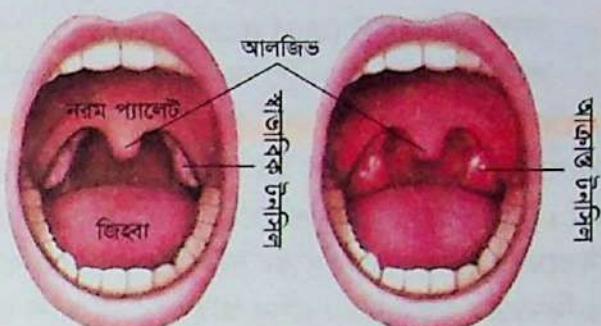
পাকস্থলির পিছনে উদরীয় গহ্বরের উর্ধ্ব বাঁপাশে মধ্যচ্ছদার ঠিক নিচে অবস্থিত হালকা বেগুনি রংয়ের একটি ডিম্বাকার, প্রায়  $13 \times 7 \times 3$  সে.মি. ঘন আয়তন (মুষ্টির মতো) ও ১৭০ গ্রাম ওজনবিশিষ্ট অঙ্গটি প্রীহা। এটি দুধরনের প্রীহামজ্জা (spleen pulp) নিয়ে গঠিত-একটি লাল, অন্যটি সাদা মজ্জা। সমগ্র গড়নটি অপেক্ষাকৃত পাতলা বহিঃস্থ ক্যাপসুলে আবৃত থাকে।

প্রীহাকে রক্তের রিজার্ভার বা ব্লাড ব্যাংক বলা হয় এবং এটি প্রায় ৩০০ মিলিলিটার রক্ত জমা রাখে। প্রীহা রক্তের প্রধান ছাঁকুনি হিসেবে কাজ করে। অধিকাংশ লোহিত রক্তকণিকা **প্রীহায়** ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলে একে লোহিত রক্তকণিকার ক্বরস্থান বলা হয়। এটি জীবাণু ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করে।

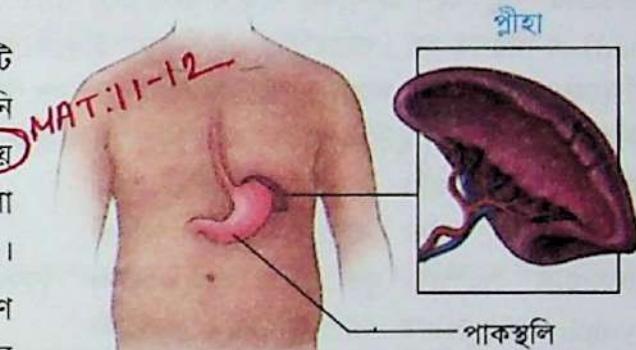
প্রীহার বহিঃস্থ ক্যাপসুল অপেক্ষাকৃত পাতলা বলে সংক্রমণ বা আঘাতে ফেটে যায়। তখন প্রীহার কাজ অন্যান্য অঙ্গের মাধ্যমে সম্পর্ক হলেও প্রীহাবিহীন দেহে প্রায়ই সংক্রমণের আশংকা থাকে এবং অনিদিষ্ট কালের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়।

### থাইমাস (Thymus)

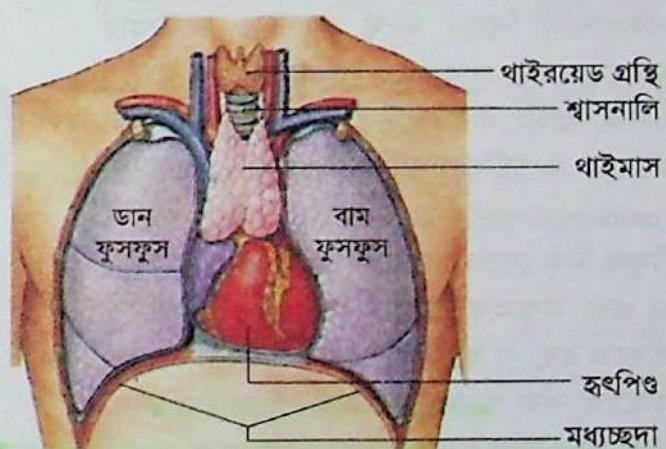
হৃৎপিণ্ডের উপরে অবস্থিত পিরামিড আকৃতির নরম, দ্বিখণ্ডিত লিফ্ফয়েড অঙ্গের নাম থাইমাস। শিশুদেহে এটি বড় ও সক্রিয় থাকে। এ সময় থাইমাস থেকে দুধরনের হরমোন ক্ষরিত হয়: থাইমোসিন ও থাইমোপোয়েটিন। এগুলো লিফ্ফনোডে লিফ্ফোসাইটের পরিপক্তা নিয়ন্ত্রণ করে। বয়ঃসন্ধিকালে এটি ক্রমশঃঃ ফ্যাটিস্যুটে পরিণত হয়। আর প্রাপ্তবয়স্কে সংক্ষিপ্ত বা অদৃশ্য হয়ে যায়। লাল অস্থিমজ্জায় উৎপন্ন শ্বেত রক্তকণিকা রক্তস্তোতে বাহিত হয়ে থাইমাসে পৌঁছে পরিপক্ত হয়। পরিপক্ত কোষগুলোকে **T-কোষ বা T-লিফ্ফোসাইট** বলে। এসব কোষ থাইমাস থেকে সারাদেহে বন্টিত হয়ে অবশেষে লিফ্ফনোডে স্থায়ী হয়। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্বেত রক্তকণিকাপুঞ্জ যা সহজাত ও অর্জিত অনাক্রম্যতায় সমন্বয় ঘটিয়ে দায়িত্ব পালন করে। বহিরাগত যেকোনো জীবাণুর (ভাইরাস/ ব্যাকটেরিয়া) শনাক্তকরণ ও বিনাশে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন প্রতিরোধী কোষে পরিণত হয়ে (T-ইফেক্টার, T-কিলার, T-হেলপার কোষ প্রভৃতি) নানা কোষগুলো দেহকে সুস্থ রাখে। প্রাপ্তবয়স্ক দেহে থাইমাস সংক্ষিপ্ত বা অদৃশ্য হলেও আগের লিফ্ফোসাইট থেকে সৃষ্টি কোষগুলো লসিকাতস্ত্রে আজীবন সক্রিয় থাকে।



চিত্র ৪.১১ : টনসিল; বায়ে-স্বাভাবিক ও ডানে আক্রান্ত



চিত্র ৪.১২ : প্রীহার অবস্থান ও গঠন



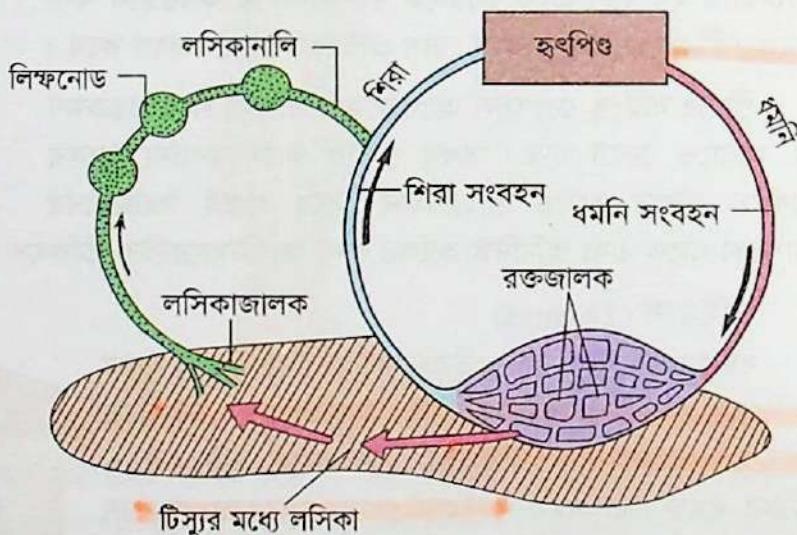
চিত্র ৪.১৩ : থাইমাসের অবস্থান ও গঠন

### লাল অস্থিমজ্জা (Red Bone Marrow)

লাল অস্থিমজ্জা হচ্ছে বিভিন্ন অস্থির ভিতর অবস্থিত স্পন্ডের মতো, অর্ধকঠিন ও লাল টিস্যু। লাল অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকা এবং প্রেইটলেট উৎপন্ন হয়। এখানে স্টেমকোষ আজীবন বিভক্ত হয়ে লিফ্ফোসাইটসহ সবধরনের রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। প্রতিরক্ষা কোষগুলো রক্তপ্রবাহে মুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গে ও টিস্যুতে পরিযায়ী হয়ে পরিণত হয়। শিশুদেহের অধিকাংশ হাড়ে লাল অস্থিমজ্জা পাওয়া যায়। প্রাণুবয়ক্ষে এ মজ্জার অবস্থান সীমিত হয়ে পড়ে কেবল নিতম্বের পেলভিস, মেরুদণ্ডের কশেরকা, স্টার্নাম বা উরঘফলক, করোটি, ক্র্যাভিকল বা কঢ়াস্থি, পর্শুকা এবং হিউমেরাস ও ফিমারের উর্ধ্বপ্রান্তে। এসব অস্থির নির্দিষ্ট অংশ ছাড়া বাকি অংশ ফ্যাটটিস্যুতে পরিণত হয়।

### লসিকা সংবহন (Circulation of Lymph)

রক্ত সরাসরি ধমনির মাধ্যমে টিস্যুকোষে পৌছাতে পারে না। ধমনি ক্রমাগত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে রক্তজালক বা কৈশিকজালিকা (blood capillaries) গঠন করে। এই জালক পুনরায় পরম্পরের সাথে যুক্ত হয়ে উপশিরা, শাখাশিরা এবং প্রধান শিরায় পরিণত হয়। রক্ত জালকের মধ্য দিয়ে আংশিক রক্ত চাপ এবং আংশিক ব্যাপন চাপের প্রভাবে রক্তরসের কিছু অংশ জালকের বাইরে বের হয়ে এসে কোষাস্ত্র স্থানে জমা হয় এবং এক ধরনের টিস্যুরস (tissue fluid)-এ পরিণত হয়। পরিবর্তিত এই টিস্যুরসই হলো লসিকা। লসিকা ও কোষের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় লসিকা থেকে অক্সিজেন, খাদ্যবস্তুর সারাংশ কোষের ভিতর প্রবেশ করে এবং কোষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থসমূহ লসিকায় মুক্ত হয়। লসিকার কিছু অংশ জালকের শিরাপ্রান্তে রক্তপ্রবাহে প্রত্যাবর্তন করে। লসিকা বহনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালিঙ্গলি পরম্পর মিলিত হয়ে লসিকাজালক গঠন করে। এসব লসিকা জালকগুলি পরম্পর যুক্ত হয়ে লসিকানালি (lymph vessels)তে পরিণত হয়। অন্তর্মুখী লসিকানালি লসিকাগ্রস্থিতে যুক্ত হয় এবং বারবার শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বহিমুখী লসিকানালিতে পরিণত হয়। সবশেষে লসিকানালি শিরার সাথে যুক্ত হয়। লসিকার মাধ্যমে সম্পন্ন সংবহনকে লসিকাসংবহন বলে। লসিকা প্রবাহ ধীর। লসিকানালিতে অবস্থানকারী অসংখ্য কপাটিকা লসিকা প্রবাহকে একমুখী (unidirectional) করে রাখে, ফলে লসিকা টিস্যুর দিক থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রবাহিত হয়। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হলে ব্যক্তিকে সক্রিয় থাকতে হয়, না হলে টিস্যুতরল বাহিকায় চলাচল করবেনা, বরং বাহিকার ভিতরে জমতে শুরু করে, ফলে টিস্যু ফুলে যায়। এ অবস্থাকে শোথ (edema) বলে।



চিত্র ৪.১৪ : লসিকা সংবহনের রেখাচিত্র

শোথের আরেকটি কারণ হচ্ছে ক্ষতের কারণে রক্ত জালকের ভেদ্যতা বেড়ে যাওয়া। ক্ষতিগ্রস্থ টিস্যুতে রক্তবাহিকার ভিতর থেকে তরল প্রবাহিত হওয়ায় ক্ষতস্থান ফুলে উঠতে দেখা যায়। মচকানো ফোলা গোড়ালি থেকে শুরু করে ভেঙে যাওয়া বুড়ো আঙুলের ফোলা এ ধরনের উদাহরণ।

রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য		
বৈশিষ্ট্য	রক্ত	লসিকা
১. বর্ণ	লাল বর্ণের পরিবহন টিস্যু।	স্বচ্ছ হলুদ থেকে সাদা বর্ণের পরিবহন টিস্যু।
২. প্রবাহ	রক্তনালিতে সুনির্দিষ্ট চাপে প্রবাহিত হয়।	লসিকানালিতে চাপহীন প্রবাহিত হয়।
৩. গঠন উপাদান	প্রাজমা, লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা নিয়ে গঠিত।	প্রাজমা ও শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত।
৪. হিমোগ্লোবিন	হিমোগ্লোবিন বিদ্যমান।	হিমোগ্লোবিন অনুপস্থিত।
৫. প্রোটিন ইত্যাদি	অধিক পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।	অল্প পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।
৬. পরিবহন	রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস ও খাদ্যসার (শর্করা ও আমিয়) পরিবাহিত হয়।	লসিকার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্যসার (লিপিড) পরিবাহিত হয়।

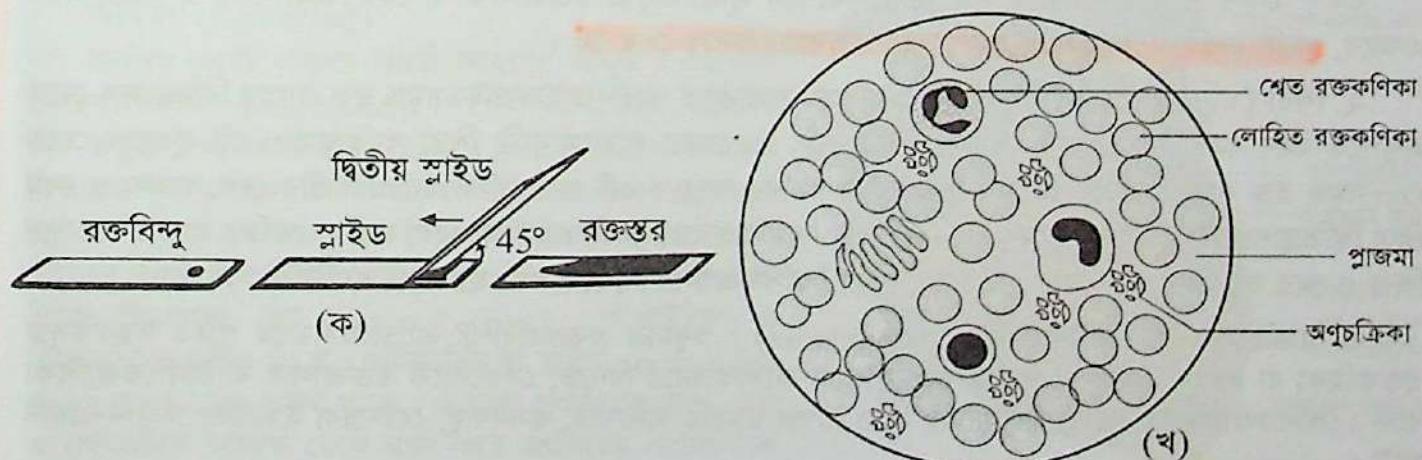
### ব্যবহারিক (Practical)

কাজ : রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : জীবাণুমুক্ত সুচ, পরিকার স্লাইড, লিশম্যান রঞ্জক, রক্ত, ড্রপার, তুলা, স্প্রিট, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি।

#### রক্ত সংগ্রহ ও স্লাইড প্রস্তুতি

- একটি জীবাণুমুক্ত নিডলের (সুচ) সাহায্যে নিজের বাম হাতের মধ্যমার অগ্রভাগ ফুটো করে একবিন্দু রক্ত স্লাইডের একপ্রান্তে সংগ্রহ করতে হবে।
- অপর একটি পরিকার স্লাইডের প্রান্ত দিয়ে ৪৫° কোণে রক্তের ফেঁটাটি সামনের দিকে এমনভাবে ঠেলে দিতে হবে যাতে প্রথম স্লাইডের উপর চাপ না পড়ে। ফলে প্রথম স্লাইডের উপর রক্তের একটি পাতলা প্রলেপ (blood film) তৈরি হবে।
- প্রলেপটি বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে।
- বাতাসে শুকানোর পর প্রলেপটির উপর লিশম্যান রঞ্জক দিয়ে প্রাবিত করতে হবে এবং একটি পেট্রিডিস দিয়ে স্লাইটটি ঢেকে রাখতে হবে।
- এক মিনিট পর (বেশি সময় রাখা যায়) লিশম্যান দ্রবণের সম্পরিমাণ পাতিত পানি স্লাইডের উপর অল্প অল্প করে ঢালতে হবে।
- এভাবে ১০ মিনিট রাখার পর স্লাইটটি পাতিত পানিতে ভালোভাবে ধূয়ে বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে।
- অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।



চিত্র ৪.১৫ : (ক) স্লাইড প্রস্তুতকরণ ও (খ) মানুষের রক্ত

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত অথবা বিজ্ঞানগারে সংরক্ষিত রক্তকণিকার স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ করে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ মিলিয়ে দেখতে হবে। প্রয়োজনে শ্রেণিশীকরণের সাহায্য নিতে হবে।

### শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. রক্তরস ও রক্তকণিকা নিয়ে রক্ত গঠিত।
২. রক্তরসে অসংখ্য লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা বর্তমান।
৩. লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার, দ্বি-অবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন।
৪. শ্বেত রক্তকণিকা বর্ণহীন ও নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং অনিয়তাকার ও অপেক্ষাকৃত বড়।
৫. অণুচক্রিকা ক্ষুদ্র ও নিউক্লিয়াসবিহীন।

**সতর্কতা :** রক্ত সংগ্রহের আগে অ্যালকোহল দিয়ে নিউল ও আঙুলের অগ্রভাগ জীবাণু মুক্ত করে নিতে হবে।

### রক্তবাহিকা (Blood Vessels)

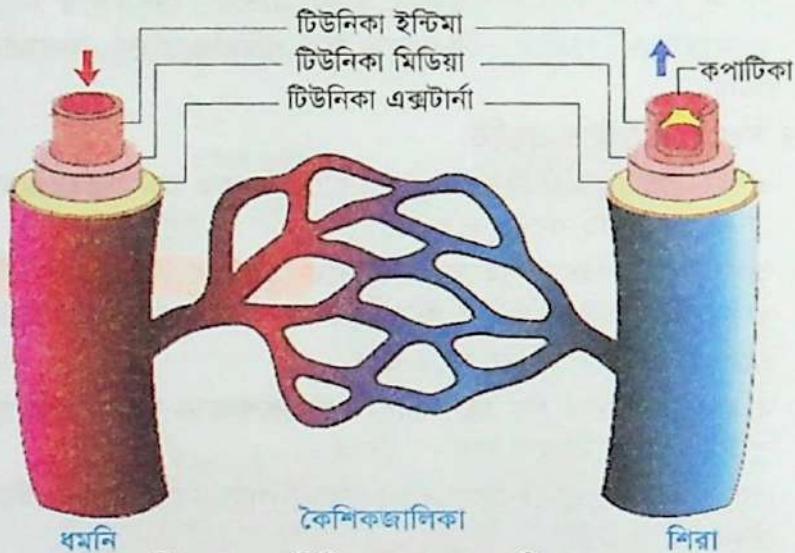
যে সব নালিকার মাধ্যমে রক্ত সংবহিত হয়, অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে, সেগুলোকে রক্তবাহিকা বলে।

আকার-আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা তিন রকম, যথা-ধমনি, শিরা ও কৈশিকজালিকা।

১. ধমনি (Arteries) : যে সব রক্তবাহিকার মাধ্যমে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে বাহিত হয়, তাদের ধমনি বলে এক্ষেত্রে পালমোনারি ধমনি ব্যতিক্রম। এটি  $\text{CO}_2$ -সমৃদ্ধ রক্তকে হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে পৌছে দেয়। **ধমনিপ্রাচীর** তিনস্তরবিশিষ্ট, যথা- (ক) যোজক টিস্যুতে গঠিত বাইরের স্তর টিউনিকা অ্যাডভেন্টিসিয়া বা টিউনিকা এক্স্ট্রার্না (tunica adventitia or tunica externa); (খ) পেশিতন্ত্র নির্মিত মাঝের স্তর টিউনিকা মিডিয়া (tunica media); এবং (গ) এন্ডোথেলিয়ামে গঠিত অন্তর্ণ্তর টিউনিকা ইন্টিমা (tunica intima)। **ধমনিপ্রাচীর** বেশ পুরু, দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক।

ধমনি ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অবশেষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রক্তজালক বা কৈশিকজালিকা-য় সমাপ্ত হয়। এভাবে, **ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে শুরু হয় এবং কৈশিকজালিকায় শেষ হয়।**

২. শিরা (Veins): যে সব রক্তবাহিকার মাধ্যমে সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে, তাদের শিরা বলে। এক্ষেত্রে পালমোনারি শিরা ব্যতিক্রম। এটি ফুসফুস থেকে  $\text{O}_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। শিরাপ্রাচীর ধমনির অনুরূপ ৩টি স্তরে গঠিত হলেও প্রাচীর বেশ পাতলা ও নরম কিন্তু স্থিতিস্থাপক নয়। এদের লুমেন (lumen) বড়। ধমনি প্রাপ্তের কৈশিকজালিকাগুলো ক্রমশ একত্রিত হয়ে প্রথমে সূক্ষ্ম শিরা ও পরে বড় শিরা গঠন করে। এভাবে, শিরা কৈশিকজালিকা থেকে শুরু হয় এবং হৃৎপিণ্ডে শেষ হয়।



চিত্র ৪.১৬ : বিভিন্ন ধরনের রক্তবাহিকা

৩. রক্তজালক বা কৈশিকজালিকা (Capillaries) : শুধুমাত্র একস্তরবিশিষ্ট এন্ডোথেলিয়ামে গঠিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রক্তবাহিকা যা প্রশাখা-ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে জালিকাকারে বিন্যস্ত, সেগুলোকে রক্তজালক বা কৈশিকজালিকা বলে। কৈশিকজালিকার রক্ত ও টিস্যুরসের মধ্যে ব্যপন ক্রিয়ায় খাদ্যসার, শ্বসনবায়ু, রেচন্দ্রব্য ইত্যাদির আদান-প্রদান ঘটে।

## ধমনি ও শিরার মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	ধমনি	শিরা
১. উৎপত্তি ও সমাপ্তি	হৃৎপিণ্ডে উৎপন্ন হয়ে দেহের কৈশিকজালিকায় সমাপ্ত হয়।	কৈশিকজালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডে সমাপ্ত হয়।
২. রক্ত প্রবাহের দিক	হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের দিকে পরিবহন করে।	দেহে থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে পরিবহন করে।
৩. রক্তের প্রকৃতি	পালমোনারি ধমনি ছাড়া অন্য ধমনিগুলো $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত উজ্জল লাল বর্ণের।	পালমোনারি শিরা ছাড়া অন্য শিরাগুলো $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত কালচে বর্ণের।
৪. প্রাচীর	বেশ পুরু ও অস্থিতিস্থাপক।	কম পুরু ও অস্থিতিস্থাপক।
৫. লুমেন (গহ্বর)	লুমেন ছোট।	লুমেন বেশ বড়।
৬. কপাটিকা	কপাটিকা থাকে না।	সেমিলুনার কপাটিকার মতো কপাটিকা থাকে।

## মানব হৃৎপিণ্ড (Human Heart)

দেহের যে প্রকোষ্ঠময় পেশল অঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন ছন্দোময় সঙ্কোচন প্রসারণের মাধ্যমে সমগ্র দেহে রক্ত সংবহিত হয় তাকে হৃৎপিণ্ড বলে। রক্তকে রক্তবাহিকার ভিতর দিয়ে সংবলনের জন্য হৃৎপিণ্ড মানবদেহের পাম্পিংমেশ্ঞা (pumping machine) বৃপ্তে কাজ করে। জীবন্ত এ পাম্পিংমেশ্ঞা দেহের বিভিন্ন অংশে থেকে শিরার মাধ্যমে আনীত রক্ত ধমনির সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে।

একজন সুস্থ মানুষের জীবন্তশায় হৃৎপিণ্ড গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রতিটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়) থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন লিটার (বা দেড় লক্ষ টন) রক্ত বের করে দেয়। প্রাণ বয়স্ক পুরুষে হৃৎপিণ্ডের ওজন ২৫০-৩৯০ গ্রাম ও স্ত্রীতে ২০০-২৭৫ গ্রাম। জ্ঞান অবস্থায় মাত্রগতে ছয় সপ্তাহ থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয় এবং আয়ত্যু এ স্পন্দন চলতে থাকে।

## অবস্থান (Position)

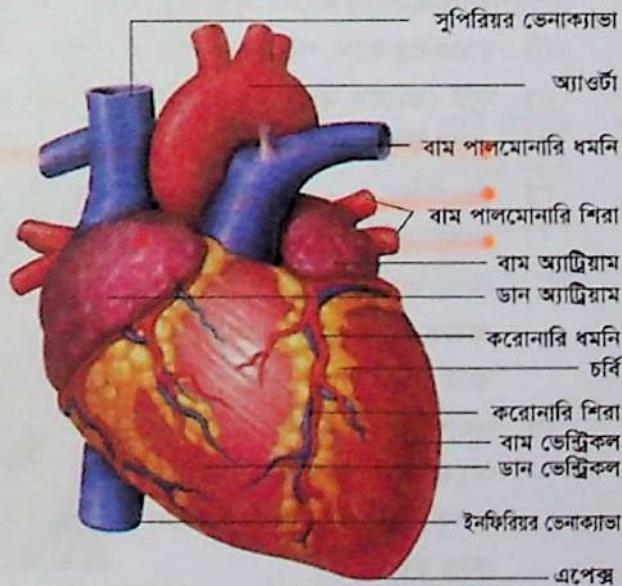
মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরে মধ্যচ্ছদার উপরে ও দুই ফুসফুসের মাঝে-বরাবর বাম দিকে একটু বেশি বাঁকা হয়ে অবস্থিত। এটি দেখতে ত্রিকোণাকার; গোড়াটি চওড়া ও উর্ধ্বমুখী থাকে, কিন্তু সুচালো শীর্ষদেশ নিচের দিকে পদ্ধতম পাঁজরের ফাঁকে অবস্থান করে।

## আকার ও আকৃতি (Shape and Size)

লালচে-খয়েরী রংয়ের হৃৎপিণ্ডটি ত্রিকোণা মোচার মতো। এর চওড়া উর্ধ্বমুখী অংশটি বেস (base), ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশটি এপেক্স (apex)। একজন প্রাণ বয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ প্রায় ৮ সেন্টিমিটার।

## আবরণ (Covering)

হৃৎপিণ্ড একটি পাতলা দ্বিতীয় আবরণে আবৃত। এর নাম পেরিকার্ডিয়াম (pericardium)। পেরিকার্ডিয়ামের বাইরের দিক তন্তুময় পেরিকার্ডিয়াম (fibrous pericardium) এবং এর ভিতরের দিক সেরাস পেরিকার্ডিয়াম (serous pericardium) নামে পরিচিত। সেরাস পেরিকার্ডিয়াম আবার দুটি স্তরে বিভক্ত, বাইরের দিকে প্যারাইটাল স্তর (parietal layer) এবং ভিতরের দিকে ভিসেরাল স্তর (visceral layer)। প্যারাইটাল ও ভিসেরাল স্তরদুটির মাঝে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড (pericardial fluid) নামক তরল পদার্থ থাকে। এ তরল হৃৎপিণ্ডকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকে সহজসাধ্য ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।



চিত্র ৪.১৭ : হৃৎপিণ্ডের বাহ্যিক গঠন

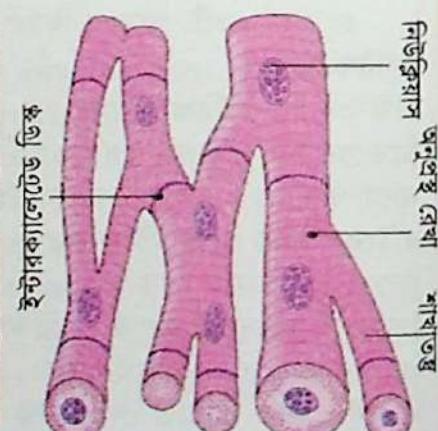
### প্রাচীর (Wall)

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশি ও যোজক টিস্যু দিয়ে গঠিত। এর প্রাচীর গঠনকারী পেশিকে কার্ডিয়াক পেশি (cardiac muscles) বলে। পেশি ও যোজক টিস্যু তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থেকে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর গঠন করে। স্তরতিনটি হলো-

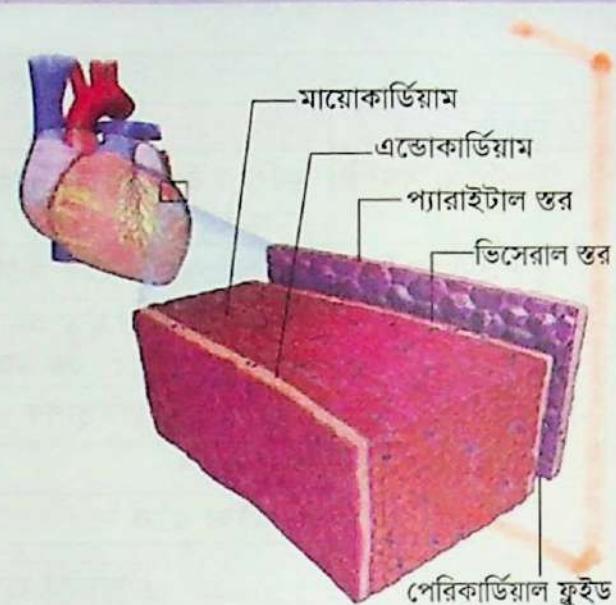
- এপিকার্ডিয়াম (Epicardium)** : এটি পাতলা ও স্বচ্ছ যোজক টিস্যু নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের সর্ববহিঃস্থ স্তর। এ স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে।
- মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium)** : এটি কার্ডিয়াক পেশি নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর। এ স্তরটি সর্বাপেক্ষা পুরু। এ স্তরের পেশি দৃঢ় প্রকৃতির এবং এগুলো হৃৎপিণ্ড সঙ্কোচন-প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
- এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium)** : এটি যোজক টিস্যু নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের অন্তঃস্থ স্তর। এটি হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, হৃৎক্ষেত্রিকাসমূহ দেকে রাখে এবং রক্তবাহিকার সাথে হৃৎপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায়।

**কার্ডিয়াক পেশির গঠন :** হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের মায়োকার্ডিয়াল স্তর বিশেষ ধরনের পেশি দিয়ে গঠিত যাকে কার্ডিয়াক পেশি বা হৃৎপেশি বলে। এ পেশির কিছু বৈশিষ্ট্য রৈখিক বা কক্ষাল পেশির মতো হলেও প্রকৃত পক্ষে এরা **বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি**। এটি হৃৎপিণ্ডের প্রতিরক্ষাকারী স্তর গঠন করে এবং নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য বহন করে :

- অসংখ্য নলাকার পেশিতন্ত্র নিয়ে এ পেশি গঠিত। কোষগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায়  $0.8\text{ mm}$  ও ব্যাস  $12-15\text{ }\mu\text{m}$ .
- **প্রতিটি কোষ সারকোলেমা (sarcolemma)** নামক সূক্ষ্ম ঝিল্লিতে আবৃত এবং কোষের মাঝাখানে একটি ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস থাকে।
- কোষের সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ সারকোপ্লাজম (sarcoplasm)-এ সমান্তরালে সজিত মায়োফাইব্রিল (myofibril) নামের সূক্ষ্ম তন্ত্র থাকে। মায়োফাইব্রিলের গায়ে অনুপস্থিতি রেখা দেখা যায়।
- পেশিতন্ত্রগুলো শাখাতন্ত্র দ্বারা পরম্পর অনিয়মিতভাবে যুক্ত হয়ে জালিকাকার গঠন তৈরি করে।
- দুটি কোষের সংযোগস্থলে সারকোলেমা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে অনুপস্থিতভাবে পুরু চাকতির মতো গঠন তৈরি করে। একে **ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক** (intercalated disc) বলে।
- **হৃৎপেশির কোষগুলোতে মাইটোকন্ড্রিয়ার আধিক্যতা** দেখা যায় যা কোষের অবিরাম অবাত শসনের সুযোগ প্রদান করে।
- **হৃৎপেশির স্থতঃস্ফূর্ত ছন্দোময় সঙ্কোচন-প্রসারণশীলতা** সম্পূর্ণরূপে অনৈচ্ছিক, কখনো ক্রান্ত হয় না।



চিত্র ৪.১৯ : কার্ডিয়াক পেশি; বায়ে-ফটোমাইক্রোগ্রাফ ও ডানে-চিহ্নিত চিত্র



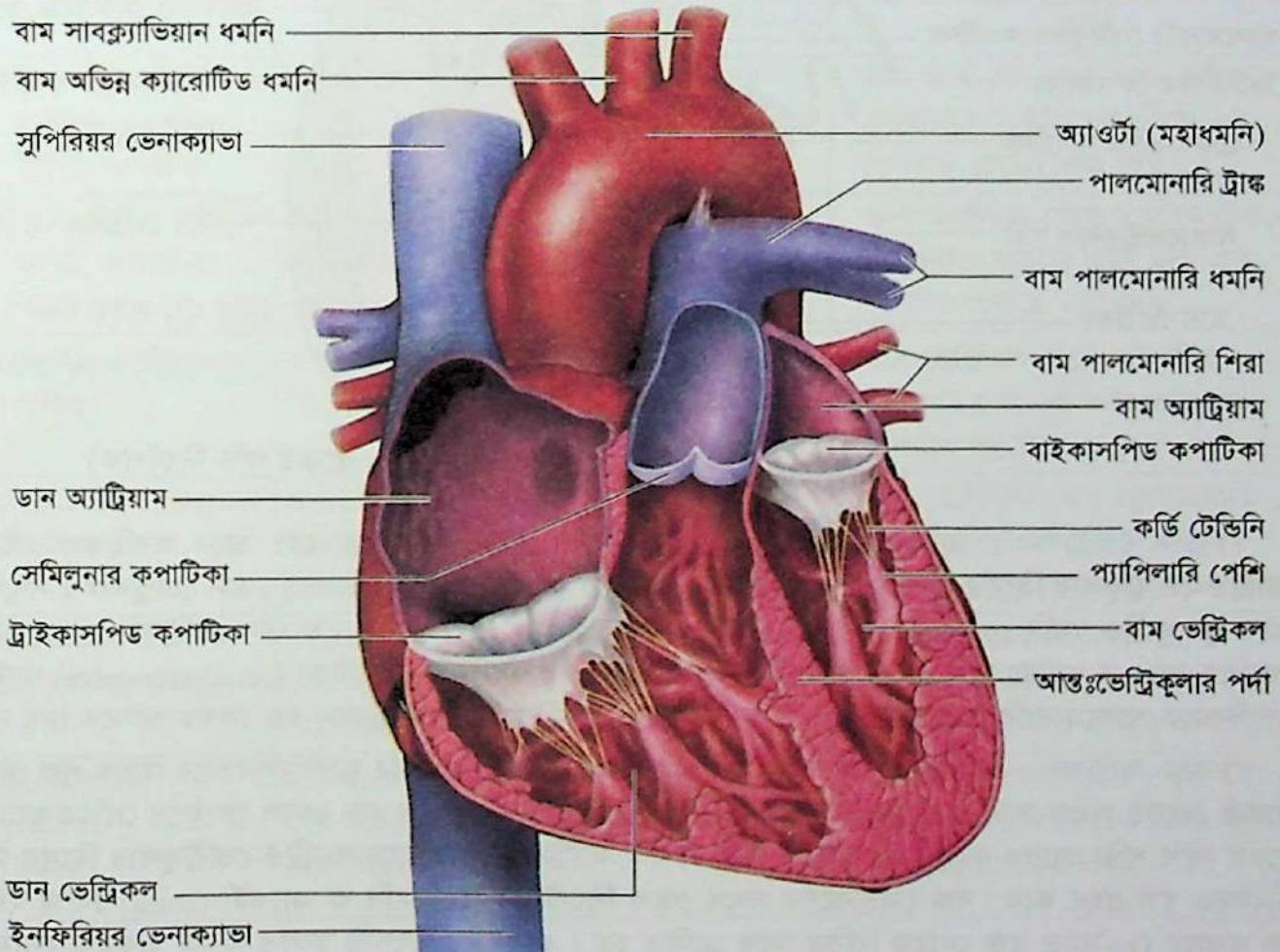
চিত্র ৪.১৮ : হৃৎপিণ্ডের আবরণ ও প্রাচীর

মায়োকার্ডিয়াম  
এন্ডোকার্ডিয়াম  
প্যারাইটাল স্তর  
ভিসেরাল স্তর  
পেরিকার্ডিয়াল ফুইড

### হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠসমূহ (Chambers of Heart)

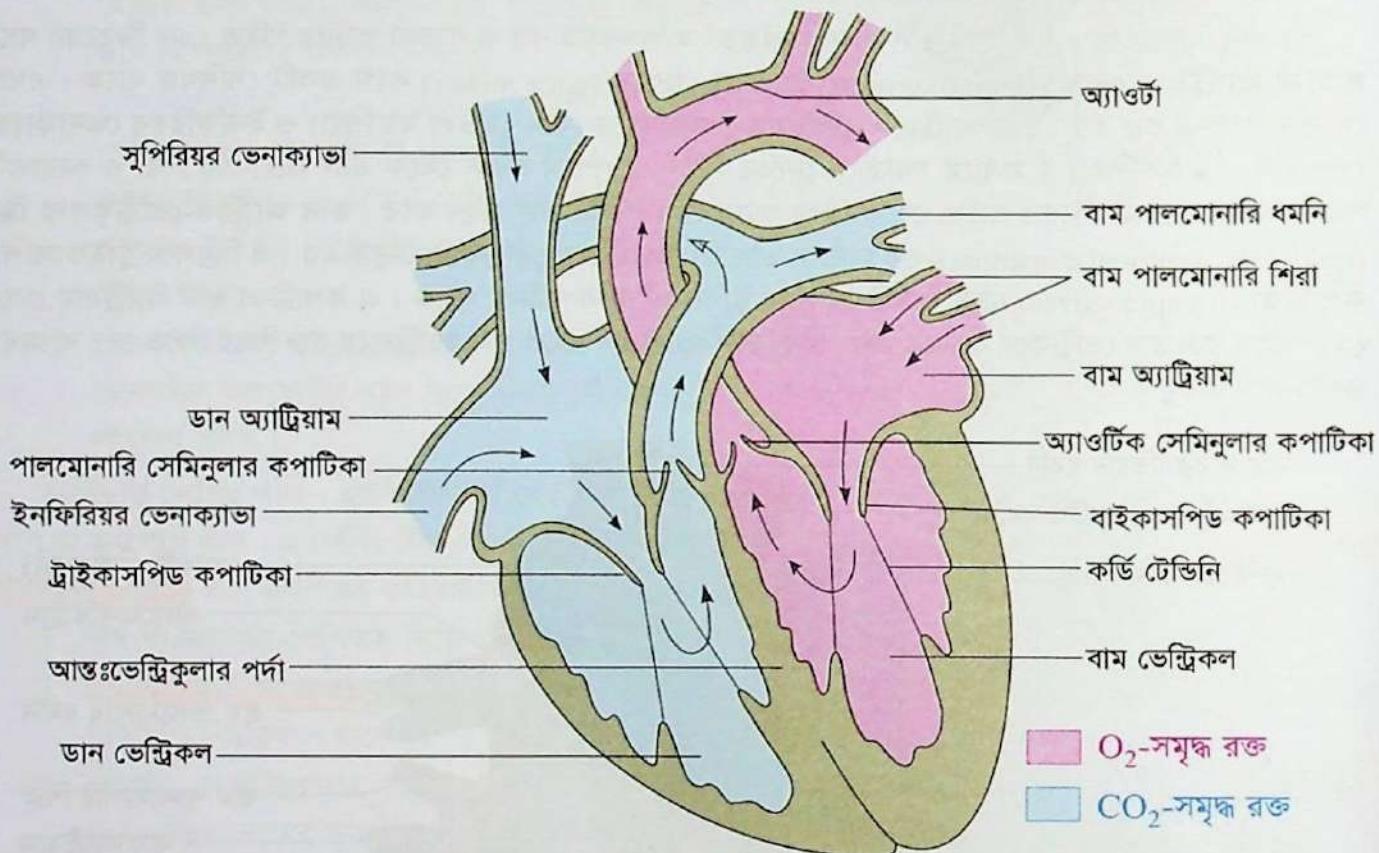
মানব হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (completely four chambered) একটি ফাঁপা অঙ্গ! এর মধ্যে উপরের দুটি অ্যাট্রিয়া (atria: একবচনে atrium) বা অলিন্দ ও নিচের দুটি ভেন্ট্রিকল (ventricle) বা নিলয়। দুটি অ্যাট্রিয়াকে দেহের অবস্থান অনুসারে ডান অ্যাট্রিয়াম ও বাম অ্যাট্রিয়াম বলে এবং ভেন্ট্রিকল দুটিকে ডান ভেন্ট্রিকল ও বাম ভেন্ট্রিকল বলা হয়। অ্যাট্রিয়ামের তুলনায় ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। ডান ও বাম অ্যাট্রিয়াম আন্তঃঅ্যাট্রিয়াল (আন্তঃঅলিন্দ) পর্দা (inter-atrial septum) এবং ডান ও বাম ভেন্ট্রিকল আন্তঃভেন্ট্রিকুলার (আন্তঃনিলয়) পর্দা (inter-ventricular septum) দিয়ে পৃথক থাকে। নিচে প্রকোষ্ঠগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

**ডান অ্যাট্রিয়াম :** এ প্রকোষ্ঠ ডান পাশে অবস্থিত, অপেক্ষাকৃত বড় ও পাতলা প্রাচীরে গঠিত। এর ভিতরের গায়ে সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (sino-atrial node) বা পেস মেকার (pace maker) নামে একটি পেশিখন্ত থাকে। এখান থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয়। ডান অ্যাট্রিয়াম সুপরিয়ির ভেনাক্যাভা (অগ্র বা উর্ধ্ব মহাশিরা) ও ইনফিরিয়ির ভেনাক্যাভা (পশ্চাত বা নিম্ন মহাশিরা)-র মাধ্যমে যথাক্রমে দেহের সম্মুখ ও পশ্চাত অঞ্চল থেকে এবং করোনারি শিরা ও করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর থেকে ফিরে আসা  $\text{CO}_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্র (right atrio- ventricular aperture)-এর মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়াম ডান ভেন্ট্রিকলে উন্মুক্ত হয়। এ ছিদ্রপথে ট্রাইকাসপিড কপাটিকা (tricuspid valves) নামে তিনটি ঝিল্লিময় টুপির মতো কপাটিকা থাকে। এ কপাটিকা ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে  $\text{CO}_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে আসতে দেয়, কিন্তু ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্ত ফিরে যেতে দেয় না অর্থাৎ কপাটিকাটি একমুখী।



চিত্র ৪.২০ : মানব হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠন

□ **বাম অ্যাট্রিয়াম :** এ প্রকোষ্ঠ বাম পাশে অবস্থিত ও অপেক্ষাকৃত ছোট ও পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট। প্রকোষ্ঠটি পালমোনারি বা ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে ফিরে আসা  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। বাম অ্যাট্রিয়াম বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্ত প্রেরণ করে। এ ছিদ্রমুখে বাইকাসপিড কপাটিকা (bicuspid valves) বা মাইট্রাল কপাটিকা (mitral valves) নামক দুটি ঝিল্লিময় টুপির মতো কপাটিকা থাকে। এটি একমুখী কপাটিকা। এ কপাটিকা বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্ত যেতে দেয়, কিন্তু বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্ত ফিরে যেতে দেয় না। বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকাগুলোর এক প্রান্ত অ্যাট্রিয়াম-ভেন্ট্রিকল ছিদ্রের মুখে এবং অপর প্রান্ত ভেন্ট্রিকলের অন্তঃপ্রাচীরের গাত্রে কর্ডি টেন্ডিনি (chordae tendinae) নামক তন্তুর সাহায্যে যুক্ত থাকে।



চিত্র ৪.২১ : হৃৎপিণ্ডের লম্বচেদ ( → = রক্তের গতি নির্দেশক)

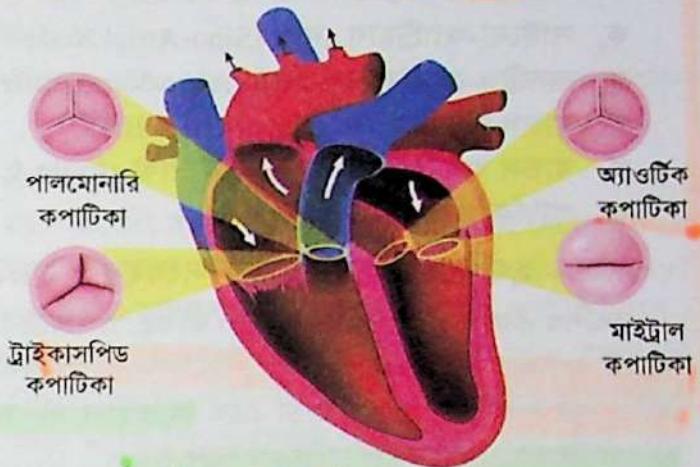
□ **ডান ভেন্ট্রিকল :** ডান ভেন্ট্রিকল বাম ভেন্ট্রিকল অপেক্ষা কিছুটা বড় এবং ডানে অবস্থিত। এটি ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে  $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত সংগ্রহ করে। ডান ভেন্ট্রিকলের সম্মুখ ভাগ থেকে ফুসফুসীয় ধমনি (pulmonary artery) সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে  $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে সংগ্রহিত হয়। এ ধমনির মুখে একটি একমুখী অর্ধচন্দ্রাকার বা সেমিলুনার কপাটিকা (semilunar valve) থাকে। এ কপাটিকাকে পালমোনারি সেমিলুনার কপাটিকা বলে। এ কপাটিকা ডান ভেন্ট্রিকলে রক্ত ফেরত আসতে দেয় না।

□ **বাম ভেন্ট্রিকল :** হৃৎপিণ্ডের বাম দিকে অবস্থিত বাম ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর তুলনামূলকভাবে অধিক পুরু কারণ এ প্রকোষ্ঠ থেকেই সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরিত হয় (অন্যদিকে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত কেবল ফুসফুসে প্রেরিত হয়) যাতে অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। বাম ভেন্ট্রিকল বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। বাম ভেন্ট্রিকলের সম্মুখ থেকে সিস্টেমিক মহাধমনি বা অ্যাওর্টা (aorta) উৎপন্ন হয় এবং এর মাধ্যমে  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে প্রেরিত হয়। এ ধমনির উৎপন্নি স্থলেও একটি একমুখী সেমিলুনার কপাটিকা থাকে যা রক্তকে বাম ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে দেয় না। এ কপাটিকার নাম অ্যাওর্টিক সেমিলুনার কপাটিকা (aortic semilunar valve)।

[শারীরিকভাবে আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী হৃৎপিণ্ডের উর্ধ্ব প্রকোষ্ঠদুটিকে auricle (অলিন্দ) নামের পরিবর্তে atrium বলে, যথা- right atrium ও left atrium। এ বইয়েও তাই auricle বা অলিন্দের পরিবর্তে ডান অ্যাট্রিয়াম ও বাম অ্যাট্রিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, auricle বলতে মেরুদণ্ডী প্রাণীর বহিঃকর্ণ (external ear) কে বোঝায়।]

### হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ (Valves of Heart)

হৃৎপিণ্ডের মধ্যদিয়ে রক্ত প্রবাহ একমুখী করার জন্য এবং O<sub>2</sub>-সমৃদ্ধ ও CO<sub>2</sub>-সমৃদ্ধ রক্তের মিশ্রণ প্রতিহত করার জন্য হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ছিদ্রপথে কপাটিকা থাকে। হৃৎপিণ্ডের অস্তঃপাচির বা এড়োকার্ডিয়াম ভাঁজ হয়ে কপাটিকা গঠিত হয়। নিচে মানুষের হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলো ছক আকারে দেখানো হলো।



চিত্র ৪.২২ : হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ

নাম	অবস্থান	বৈশিষ্ট্য	কাজ
১. বাইকাসপিড কপাটিকা বা মাইট্রাল কপাটিকা বা দ্বিপত্রী কপাটিকা	বাম অ্যাট্রিয়াম ও বাম ভেন্ট্রিকলের সংযোগস্থলে।	দুটি খিলিময় কপাটিকা।	বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
২. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বা ত্রিপত্রী কপাটিকা → MAT. । ৩-। ৭	ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলের সংযোগস্থলে।	তিনি খিলিময় কপাটিকা।	ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে ডান ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৩. অ্যাওর্টিক সেমিলুনার কপাটিকা	বাম ভেন্ট্রিকল ও অ্যাওর্টার সংযোগস্থলে।	সেমিলুনার বা অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা।	বাম ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টায় রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৪. পালমোনারি সেমিলুনার কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকল ও পালমোনারি ধমনির সংযোগস্থলে।	সেমিলুনার কপাটিকা।	ডান ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি ধমনিতে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৫. থিবেসিয়ান বা করোনারি কপাটিকা	করোনারি সাইনাস ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে।	সেমিলুনার কপাটিকা।	করোনারি সাইনাস থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।
৬. ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা	ইনফিরিয়ার ভেনাক্যাভা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থল।	সেমিলুনার কপাটিকা।	ইনফিরিয়ার ভেনাক্যাভা থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।

### হৃৎপিণ্ডের সংযোগী টিস্যু (Junctional Tissues of Heart)

হৃৎপিণ্ডে কতগুলো প্রয়োজনীয় ও বিশেষ ধরনের গঠন থাকে যারা হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি ও পরিবহন করে। এদেরকে হৃৎপিণ্ডের সংযোগী বা জাংশনাল টিস্যু বলে। এগুলো হলো :

- ক. সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node = SAN)
- খ. অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড (Atrio-Ventricular Node = AVN)
- গ. বাল্বল অব হিজ (Bangle of His = BH)
- ঘ. বাল্বল অব হিজের ডান ও বাম শাখা (Right & Left branches of BH)
- ঙ. পারকিঞ্জ তন্ত্র (Purkinje fibres)

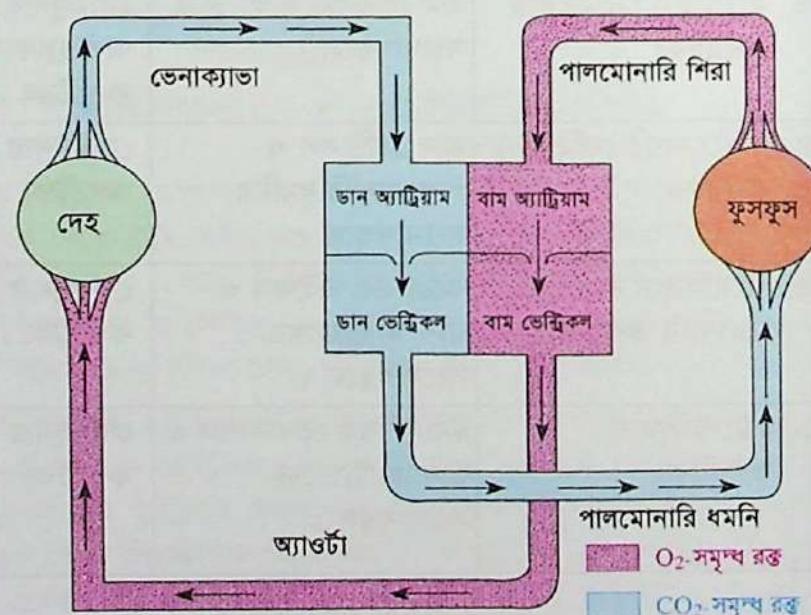
### হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন – Circulation of Blood through the Heart

হৃৎপিণ্ড একটি সঞ্চোচন-প্রসারণশীল জীবস্ত পাম্পয়ন্ত্রের মতো কাজ করে। প্রাণী বয়স্ক মানুষে বিশ্বামরত অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ বার (গড়ে ৭৫ বার) হৃৎস্পন্দন ঘটে অর্থাৎ দিনে প্রায় একলক্ষ বার স্পন্দন ঘটে। এতে প্রায় ১৪০০ লিটার রক্ত সংবহন করে। তাছাড়া এতে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাতে ধমনি, শিরা ও কৈশিকজালকের মাধ্যমে ৮০,০০০ কিলোমিটারেরও অধিক পথ অতিক্রম করে হয়।

হৃৎপিণ্ডের সঞ্চোচন ও প্রসারণকে যথাক্রমে সিস্টোল (systole) ও ডায়াস্টোল (diastole) বলে। একটি সিস্টোল ও তার পরবর্তী একটি ডায়াস্টোল নিয়ে একটি হৃৎস্পন্দন (heart beat) সম্পন্ন হয়। হৃৎপিণ্ডের ডায়াস্টোলের সময় রক্ত হৃৎপিণ্ডের গহ্বরে প্রবেশ করে এবং পরবর্তী সিস্টোলের সময় রক্ত হৃৎপিণ্ডের গহ্বর থেকে সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। এভাবে একটি ছদ্মোচয় পদ্ধতিতে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সংবহন করে। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে কোন নিউরন নেই। সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোড বা পেসমেকার (sinoatrial node or pace maker) এবং অন্যান্য নোডাল টিস্যুর মাধ্যমে হৃৎস্পন্দন শুরু ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে নিচে বর্ণিত উপায়ে রক্ত সংবহিত হয়।

- দেহের উর্ধ্বভাগ থেকে সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার (উর্ধ্ব মহাশিরা) মাধ্যমে এবং নিম্নভাগ থেকে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভার (নিম্ন মহাশিরা) মাধ্যমে  $\text{CO}_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে। একই সময়ে পালমোনারি শিরার মাধ্যমে  $\text{O}_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে আসে।
- অ্যাট্রিয়ামদুটি সঙ্কুচিত হলে অ্যাট্রিয়ামের ভিতরে চাপ বৃদ্ধির কারণে বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকলের বাইকাসপিড কপাটিকা ও ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকলের ছিদ্রের ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। ফলে বাম অ্যাট্রিয়ামের রক্ত বাম ভেন্ট্রিকলে এবং ডান অ্যাট্রিয়ামের রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে প্রবেশ করে।
- অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে রক্ত আসার পর পরই অ্যাট্রিয়ামের শুথন (relaxation) ঘটতে শুরু করে এবং একই সময়ে ভেন্ট্রিকলের সঞ্চোচন ঘটে।



চিত্র ৪.২৩ : হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন (চিত্রানুগ)

- ভেন্ট্রিকলের সঙ্গে ভেন্ট্রিকলে চাপ বৃদ্ধির কারণে বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বক্ত হয় এবং অ্যাওর্টা ও পালমোনারি ধমনির মুখের সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়।
- ফলে বাম ভেন্ট্রিকলের  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টা দিয়ে সমগ্রদেহে ও ডান ভেন্ট্রিকলের  $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনি পথে ফুসফুসের দিকে ধাবিত হয়।

এভাবেই হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের সঙ্গে-শুখন (contraction-relaxation) অর্থাৎ স্পন্দনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের রক্ত সন্ধানল সংঘটিত হয়।

### দ্বিবর্তনী সংবহন (Double Circulation)

মানুষের হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে দ্বিবর্তনী সংবহন সংঘটিত হয়। দ্বিবর্তনী সংবহনের অর্থ হলো রক্ত সমগ্র দেহে প্রতিবার সংবহনের জন্য দুবার হৃৎপিণ্ড অতিক্রম করে। দ্বিবর্তনী সংবহনের মধ্যে একটি হচ্ছে পালমোনারি (pulmonary) সংবহন-হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুস এবং অন্যটি সিস্টেমিক (systemic) সংবহন-হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের অবশিষ্ট অংশে। দ্বিবর্তনী সংবহনের সুবিধা হলো অক্সিজেন গ্রহণের জন্য রক্তকে ফুসফুসে প্রেরণ করা যায় এবং সমগ্র দেহে সংবহনের জন্য পুনরায় পাস্প করার আগে হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে। ফুসফুসের কৈশিক জালিকার মাধ্যমে পরিবহনের সময় রক্তের চাপ কমে যায়, সূতরাং হৃৎপিণ্ড থেকে সমগ্র দেহে সংবহনের আগে রক্তের চাপ পূর্বাবস্থায় ফেরত আসে এবং বেড়ে যায়। হৃৎপিণ্ড দুভাগে বিভক্ত থাকার জন্য দ্বিবর্তনী সংবহন সম্ভব হয়েছে। একটি অ্যাট্রিয়াম এবং একটি ভেন্ট্রিকল সমন্বয়ে প্রতি অর্ধাংশ গঠিত। একটি অর্ধাংশ  $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে প্রেরণ করে, এবং অন্য অর্ধাংশ  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত দেহের অবশিষ্ট অংশে প্রেরণ করে।

**হৃৎপিণ্ড কখনও অবসন্ন হয় না কেন? (Why is heart never fatigued?) :** একটি উদ্বীপনা প্রয়োগের পরবর্তী যে সময়কালের মধ্যে কোনো উদ্বীপনশীল কোষ বা টিস্যু দ্বিতীয় উদ্বীপনায় সাড়া দেয় না, তাকে নিঃসাড়কাল বলে। হৃৎপিণ্ড গঠনকারী হৃৎপেশি দীর্ঘতম নিঃসাড়কালের অধিকারী হওয়ায় তা কখনও অবসন্ন হয় না। সাধারণত পরপর সঙ্গে সঙ্গে ফলে বিপাকীয় বর্জ্য (বিশেষ করে ল্যাকটিক এসিড) জমা হওয়ার কারণে কোষ বা টিস্যু অবসন্ন হয়। হৃৎপেশির নিঃসাড়কাল দীর্ঘ হওয়ায় তা এই সময়ের মধ্যে বর্জ্য পদার্থ থেকে মুক্ত হয়। এছাড়া হৃৎপেশি সরাসরি ল্যাকটিক এসিডকে পুষ্টির জন্য ব্যবহার করতে পারে। এসব কারণে হৃৎপিণ্ড কখনও অবসন্ন হয় না।

হৃৎপিণ্ডের প্রধান গাঠনিক উপাদানসমূহ এবং এদের কাজ	
হৃৎপিণ্ডের গাঠনিক উপাদান	প্রধান কাজ
অ্যাওর্টা	অ্যাওর্টা দেহের বৃহত্তম ধমনি। ফুসফুস ছাড়া অন্য সকল অঙ্গে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ (oxygenated) রক্ত পরিবহন করে। পালমোনারি ধমনি অক্সিজেন-রিক্ত (de-oxygenated) রক্ত ফুসফুসে বহন করে।
পালমোনারি শিরা	ফুসফুস থেকে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম অ্যাট্রিয়ামে পরিবহন করে।
বাম অ্যাট্রিয়াম	পালমোনারি শিরার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে।
বাম ভেন্ট্রিকল	হৃৎপিণ্ডের সর্বাধিক পেশিবহুল অংশ। অ্যাওর্টার মাধ্যমে সারাদেহে রক্ত পাস্প করে।
বাইকাসপিড কপাটিকা	বাম ভেন্ট্রিকলের সঙ্গে সঙ্গে বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পশ্চাত প্রবাহ প্রতিরোধ করে।
কর্ড টেন্ডিনি	ভেন্ট্রিকলের সঙ্গে সঙ্গে কপাটিকার অভ্যন্তরভাগ বাইরের দিকে ঘুরে যাওয়া প্রতিরোধ করে এবং মহাধমনি থেকে রক্তকে বাম ভেন্ট্রিকলে পশ্চাত প্রবাহে বাধা দেয়।
ডান ভেন্ট্রিকল	পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে অক্সিজেন-রিক্ত রক্তকে ফুসফুসে পাস্প করে।
ট্রাইকাসপিড কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকলের সঙ্গে সঙ্গে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পশ্চাত প্রবাহ প্রতিরোধ করে।
সেমিলুনার কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকলের শিথিল অবস্থায় পালমোনারি ধমনি থেকে রক্তের পশ্চাত প্রবাহ প্রতিরোধ করে এবং মহাধমনি থেকে রক্তকে বাম ভেন্ট্রিকলে পশ্চাত প্রবাহে বাধা দেয়।
ডান অ্যাট্রিয়াম	ভেন্ট্রিকলের মাধ্যমে ফুসফুস ছাড়া দেহের অন্য সকল অঙ্গ থেকে অক্সিজেন-রিক্ত রক্ত গ্রহণ করে।
ভেন্ট্রিকলের ক্যাডা	দেহের এই প্রধান শিরার মাধ্যমে অক্সিজেন-রিক্ত রক্ত ডান অ্যাট্রিয়ামে ফেরত আসে।

### মাছ এবং মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

মাছের হৃৎপিণ্ড	মানুষের হৃৎপিণ্ড
১. দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।	১. চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।
২. ১টি অ্যাট্রিয়াম ও ১টি ভেন্ট্রিকল।	২. দুটি অ্যাট্রিয়াম ও দুটি ভেন্ট্রিকল।
৩. সাইনাস ভেনোসাস নামক উপপ্রকোষ্ঠ আছে।	৩. সাইনাস ভেনোসাস নেই।
৪. কেবল $\text{CO}_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।	৪. $\text{O}_2$ -সমৃদ্ধ ও $\text{CO}_2$ -সমৃদ্ধ উভয় ধরনের রক্ত পরিবহন করে।
৫. একচক্রী রক্ত সংবহন ঘটে।	৫. দ্বিচক্রী সংবহন ঘটে।

### হার্টবিট-কার্ডিয়াক চক্র (Cardiac Cycle)

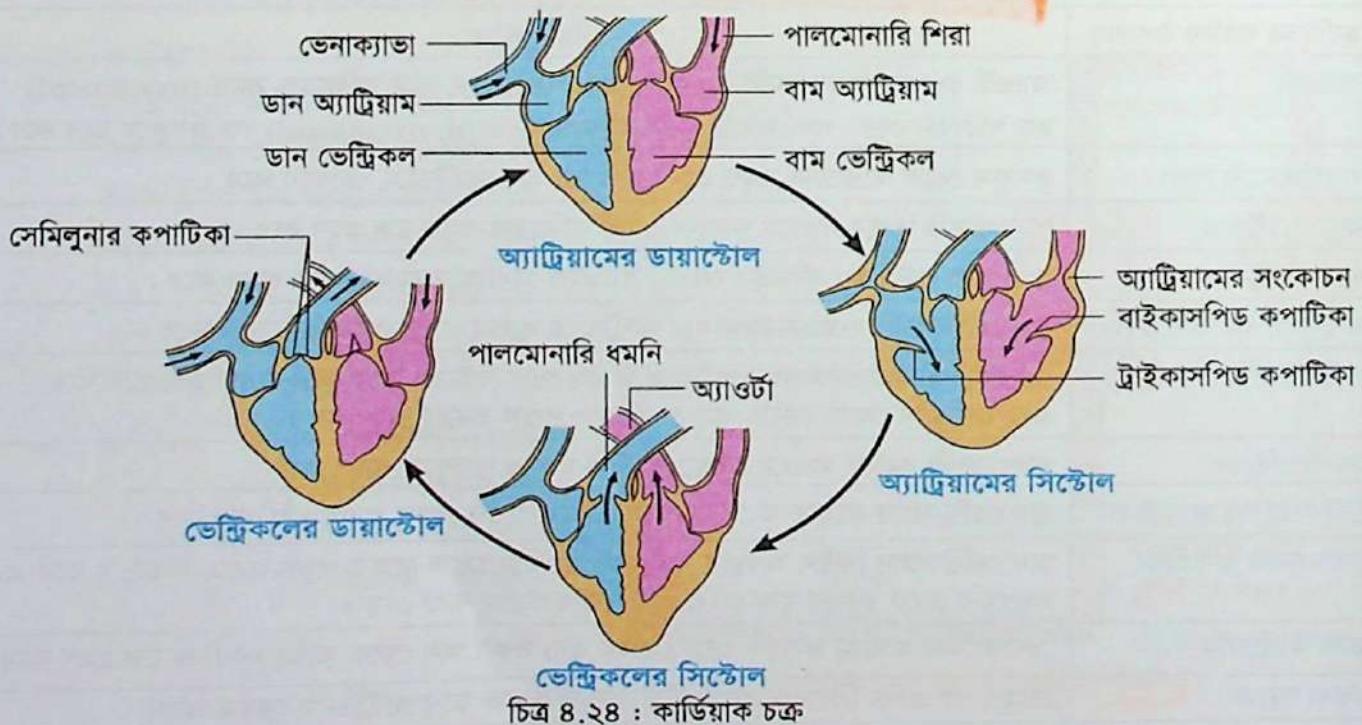
হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলদুটির পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভিতরে গতিশীল থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলোর সংকোচনকে সিস্টোল (systole) ও প্রসারণকে ডায়াস্টোল (diastole) বলে। হৃৎপিণ্ডের একবার সংকোচন (সিস্টোল) ও একবার প্রসারণ (ডায়াস্টোল)-কে একত্রে হার্টবিট বা হৃৎস্পন্দন (heart beat) বলা হয়। প্রাণ্বয়ক্ষ সুস্থ ব্যক্তির হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার। প্রতি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন করতে সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের যে চক্রকার ঘটনাবলি অনুসৃত হয় তাকে কার্ডিয়াক চক্র বা হৃৎচক্র বলে। যদি প্রতি মিনিটে গড়ে ৭৫ বার হার্টবিট হয় তবে কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল  $\frac{60}{75} = 0.8$  সেকেন্ড। স্বাভাবিকভাবেই অ্যাট্রিয়াল চক্র এবং ভেন্ট্রিকুলার চক্র উভয়েরই স্থিতিকভাবে **0.8 সেকেন্ড**।

**DAT: 16-17**

### কার্ডিয়াক চক্র চলাকালীন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সংবহন

কার্ডিয়াক চক্র চলাকালীন কীভাবে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সংবহন হয় তা নিচের চারটি ঘটনাবলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

১. **অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল (Atrial diastole)** : এ সময় **অ্যাট্রিয়ামদুটি** প্রসারিত বা **শিথিল** অবস্থায় থাকে। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়। অ্যাট্রিয়াম-মধ্যবর্তী চাপহাস পায়, ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে  $\text{CO}_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত সুপরিয়র ভেনাক্যাভা ও ইনফিল্রিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান অ্যাট্রিয়ামে ও পালমোনারি শিরা দিয়ে



ফুসফুস থেকে  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত বাম অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। এ সময় হৃৎপিণ্ডের পেশি থেকেও  $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে। অ্যাট্রিয়ামদুটি রক্তপূর্ণ হলে অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ঘটে। এ দশার সময়কাল ০.৭ সেকেণ্ড।

**২. অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল (Atrial systole) :** অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল শেষ হলে প্রায় একই সাথে উভয় অ্যাট্রিয়াম সঞ্চুচিত হয়। যদিও সঙ্কোচনের চেতু প্রথমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে শুরু হয়ে বাম অ্যাট্রিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে। ডান অ্যাট্রিয়ামের সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (sino-atrial node) থেকে সঙ্কোচনের সূত্রপাত ঘটে। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ০.১ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। প্রথমার্দে অর্থাৎ প্রথম ০.০৫ সেকেণ্ড সঙ্কোচন সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে, একে ডায়নামিক (dynamic) পর্যায় বলে। আর দ্বিতীয়ার্দে অর্থাৎ পরবর্তী ০.০৫ সেকেণ্ড ক্ষীণতর হতে হতে প্রশমিত হয়। একে বলে অ্যাডায়নামিক (adynamic) পর্যায়।

**৩. ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল (Ventricular systole) :** অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের পরপরই (প্রায় ০.১-০.২ সেকেণ্ড পর) ভেন্ট্রিকলদুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সঞ্চুচিত হয়। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা সজোরে বক্স হয় এবং সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়। এতে লাব (lub) সদৃশ প্রথম শব্দের সৃষ্টি হয়। ভেন্ট্রিকল-মধ্যবর্তী চাপ বৃদ্ধি পায় এবং ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত ভেন্ট্রিকলের বাইরে নির্গত হয়। ডান ভেন্ট্রিকল থেকে  $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম ভেন্ট্রিকল থেকে  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টায় প্রবেশ করে। এ দশার সময়কাল ০.৩ সেকেণ্ড।

**৪. ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল (Ventricular diastole) :** ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলের পরপরই এর ডায়াস্টোল শুরু হয়। এ দশার সময়কাল ০.৫ সেকেণ্ড। যখনই ভেন্ট্রিকল প্রসারিত হতে থাকে তখন ভেন্ট্রিকল মধ্যস্থ চাপ কমতে থাকে। ফলে অ্যাওর্ট ও পালমোনারি ধমনির রক্ত ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু অতি দ্রুত সেমিলুনার কপাটিকা বক্স হয়ে যায়। এ সময় ডাব (dub) সদৃশ দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং, হৃৎপিণ্ডের শব্দগুলো হচ্ছে-

ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল= লাব (lub); ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল = ডাব (dub)।

অ্যাট্রিয়াম		ভেন্ট্রিকল	
ডায়াস্টোল	সিস্টোল	ডায়াস্টোল	সিস্টোল
০.৭ সে.	০.১ সে.	০.৫ সে.	০.৩ সে.

MAP ১০-১১ ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ অব্যাহত থাকায় এর ভিতরকার চাপ ক্রমশ কমতে থাকে এবং তা যখন অ্যাট্রিয়ামের চাপের নিচে নেমে যায় তখন অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা খুলে যায়। ভেন্ট্রিকল তখন অ্যাট্রিয়াম থেকে আগত রক্তে পূর্ণ হতে থাকে। সামান্য বিশ্রামের পর আবার আগের মতো ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল শুরু হয়।

### হার্টবিট-এর মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্বীপনা পরিবহন

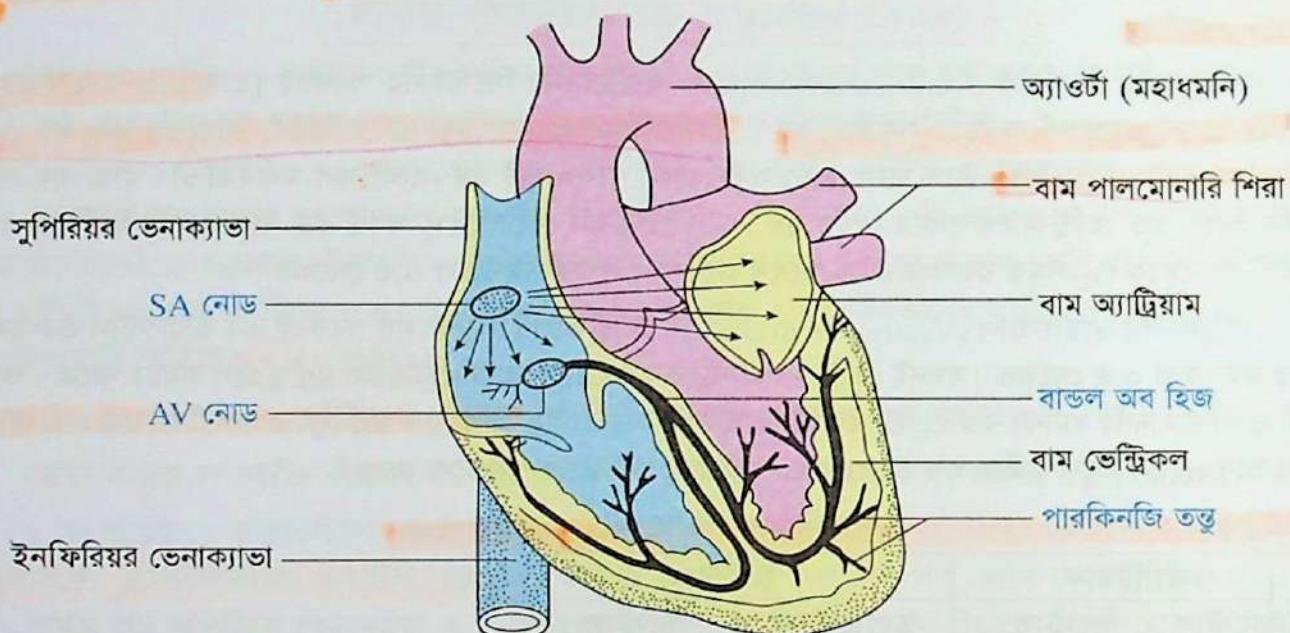
(Myogenic Regulation of Heart Beat and Transmission of Impulse)

মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঞ্চুচিত-প্রসারিত হয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়। এতে প্রচণ্ড গতিতে দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। বাইরের কোন উদ্বীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ (myogenic = muscle origin; myo = muscle + genic = giving rise to) বলে অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র বা হরমোন, কিংবা অন্য কোন উদ্বীপনা ছাড়াই নিজ থেকে হংস্পন্দন তৈরি হয়। কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে  $O_2$ -সমৃদ্ধ লবণ দ্রবণে ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে দিলে তাতে বাইরের কোন উদ্বীপনা ছাড়াই বেশ কিছু সময় পর্যন্ত হার্টবিট চলতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের কিছু বৃপ্তান্তরিত হৃৎপেশি মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। হৃৎপিণ্ডের এ বিশেষ ধরনের পেশিগুলোকে সম্মিলিতভাবে সংযোগী টিস্যু বা জাংশনাল টিস্যু (junctional tissue) বলে। হৃৎপিণ্ডের সংযোগী টিস্যুগুলো নিচে বর্ণিত চার ধরনের

DAT: ১৭-১৮

১. সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node, সংক্ষেপে SAN) : এটি ডান অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে, ডান অ্যাট্রিয়াম ও সুপরিয়ের ভেনাক্যাভার ছিদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কিছু স্নায়ুপ্রাপ্তসহ অন্ন সংখ্যক হৃৎপেশিতন্ত্র নিয়ে গঠিত। এগুলো ১০-১৫ mm লম্বা, ৩ mm চওড়া এবং ১ mm পুরু। SAN থেকে সৃষ্টি একটি অ্যাকশন পটেনসিয়াল (action potential) ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে হার্টবিট শুরু হয়। এ অ্যাকশন পটেনসিয়াল ছড়িয়ে সাথে সাথে স্নায়ু উদ্দীপনার অনুরূপ উভেজনার একটি ছোট তরঙ্গ হৃৎপেশির দিকে অতিক্রান্ত হয়। এটি অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে ছড়িয়ে অ্যাট্রিয়ামের সঙ্কোচন ঘটায়। SAN-কে **পেসমেকার** (pacemaker) বা হৃদস্পন্দক বলে, কারণ প্রতিটি উভেজনার তরঙ্গ এখানেই সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী উভেজনার তরঙ্গ সৃষ্টির উদ্দীপক হিসেবেও এটি কাজ করে।

MAT: ১৯-২০



চিত্র ৪.২৫ : মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যু

২. অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড (Atrio-Ventricular Node, সংক্ষেপে AVN) : ডান অ্যাট্রিয়াম-ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে অবস্থিত SAN-এর অনুরূপ গঠন বৈশিষ্ট্যের AVN টিস্যু AV বাল্লে নামক বিশেষ পেশিতন্ত্র গুচ্ছের সাথে যুক্ত থাকে। SAN থেকে AVN এ উদ্দীপনা পরিবহনে ০.৩ সেকেন্ড সময় লাগে। AVN-এ আগত উদ্দীপনা ০.০৯ সেকেন্ড দেরি করে। একে AV Nodal Delay বলে। এরপর AV bundle এর মাধ্যমে উদ্দীপনা ভেন্ট্রিকলের পেশিতে পৌছতে আরও ০.০৪ সেকেন্ড সময় লাগে। অর্থাৎ SAN এ উদ্দীপনা তৈরি হওয়ার পরে উদ্দীপনা ভেন্ট্রিকলে পৌছতে মোট ০.১৬ সেকেন্ড সময় লাগে। এর ফলে ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল শুরুর পূর্বে অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল সম্পন্ন হয়।

৩. বাল্ল অব হিজ (Bundle of His) : হৃৎপিণ্ডে এ বিশেষ টিস্যুটি AV নোড থেকে উৎপন্ন হয়ে **আতঃভেন্ট্রিকুলার** (আতঃনিলয়) প্রাচীরের পশ্চাত্ত্বাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ডান ও বাম শাখায় বিভক্ত হয়ে ভেন্ট্রিকলের পারকিনজি তন্তুতে মিলিত হয়। এটি AV নোড থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে সঞ্চারণ ঘটায়।

৪. পারকিনজি তন্তু (Purkinje fibre) : এ তন্তুগুলো বাল্ল অব হিজ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে জালক সৃষ্টি করে। বাল্ল অব হিজ থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনা পারকিনজি তন্তুর মাধ্যমে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে ছড়িয়ে পড়ে ভেন্ট্রিকল দুটির সঙ্কোচন ঘটায়। হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যুগুলোর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের অনুক্রমটি নিয়ন্ত্রণ :

SA নোড → AV নোড → বাল্ল অব হিজ → পারকিনজি তন্তু

## রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টরের ভূমিকা (Role of Baroreceptor in Controlling Blood Pressure)

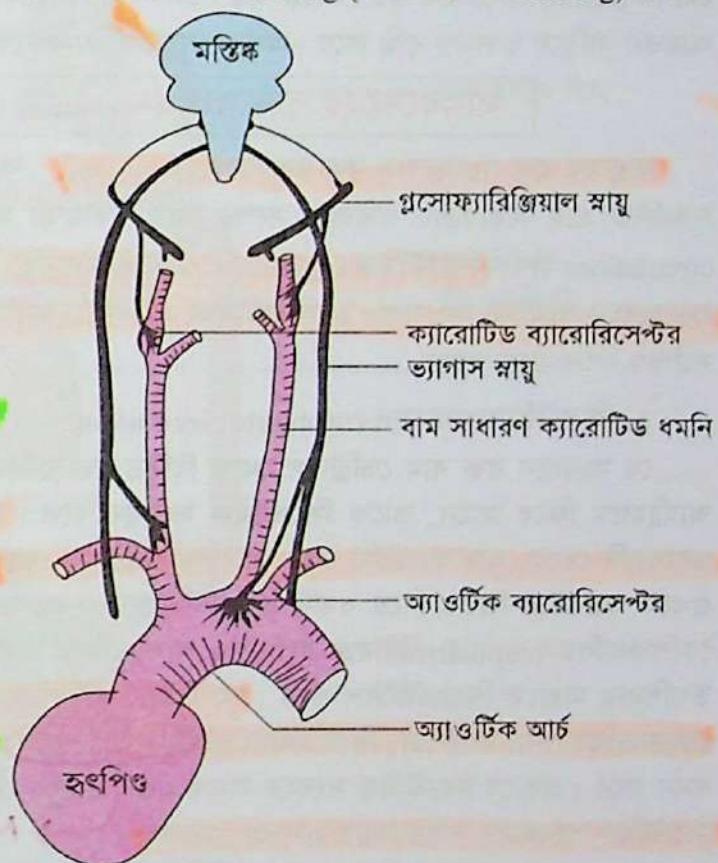
### রক্তচাপ বা রাড প্রেসার (Blood pressure)

রক্তনালির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রাচীর গাত্রে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ বলে। হৃৎপিণ্ডের বিশেষ করে ভেট্রিকল (নিলয়)-এর সঙ্কোচনের ফলেই রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে অব্যাহত বহমান থাকে। ভেট্রিকলের সঙ্কোচন (systole) অবস্থায় রক্তচাপ বেশি থাকে এবং এ চাপকে সিস্টোলিক চাপ (systolic pressure) বলে। অন্যদিকে ভেট্রিকলের প্রসারণ (diastole) কালে রক্তচাপ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। একে বলা হয় ডায়াস্টোলিক চাপ (diastolic pressure)। একজন সুস্থ প্রাণীর মানুষের স্বাভাবিক সিস্টোলিক চাপ হচ্ছে ১০০-১৩৯ mmHg (অপটিমাম ১২০ mmHg) এবং স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক চাপ ৬০-৮৯ mmHg (অপটিমাম ৮০ mmHg)। রক্ত স্বাভাবিক সীমার উপরে থাকলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ (hypertension) এবং স্বাভাবিক সীমার নিচে থাকলে তাকে নিম্ন রক্তচাপ (hypotension) বলে। মানুষের রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম স্ফিগমোম্যানোমিটার (sphygmomanometer)। বয়স, লিঙ্গ, পেশা, খাদ্যাভ্যাস, জীবন্যাপন পক্ষতি ইত্যাদি কারণে মানুষের রক্তচাপের তারতম্য ঘটে।

### ব্যারোরিসেপ্টর (Baroreceptors)

**মানুষের রক্তবাহিকার প্রাচীরে বিশেষ সংবেদী স্নায়ু** প্রান্ত (sensory nerve ending) থাকে। এগুলো রক্তচাপ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয় এবং দেহে রক্ত চাপের ভারসাম্য রক্ষা করে। এ সংবেদী স্নায়ু প্রান্তকে ব্যারোরিসেপ্টর বলে। এসব স্নায়ু প্রান্ত অস্থাভাবিক রক্তচাপ শনাক্ত করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যে বার্তা পাঠায় তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হৃৎস্পন্দন মাত্রা ও শক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তচাপ স্বাভাবিক করণে ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি ব্যারোরিফেক্স (baroreflex) নামে পরিচিত।

ব্যারোরিসেপ্টর দু'রকম—উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর এবং নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর।



চিত্র ৪.২৬ : অ্যাওটিক এবং ক্যারোটিক ব্যারোরিসেপ্টর

১. **উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর (High-Pressure Baroreceptors)** : অনুপস্থিত অ্যাওটিক আর্চ এবং ডান ও বাম অনুপস্থিত ক্যারোটিড ধমনির ক্যারোটিড সাইনাস-এ এসব ব্যারোরিসেপ্টর অবস্থান করে। রক্তের চাপ বেড়ে গেলে অর্থাৎ রক্তনালির প্রসারণ ঘটলে সেখানকার ব্যারোরিসেপ্টরগুলো উদ্বৃষ্টি হয় এবং এ উদ্বৃষ্টি মন্তিকের মেডুলায় সঞ্চালিত হয় এবং এখানে ভ্যাসোমোটর (vasomotor) কেন্দ্রটি দমিত হয়। ফলে সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু বরাবর হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালিতে চেষ্টীয় (motor) বা আক্তাবহ উদ্বৃষ্টি পরিবহনের হারহাস পায়। আজ্ঞাবহ উদ্বৃষ্টি কর্মত হৃৎপিণ্ডের পাস্পিং ক্রিয়া এবং রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহনের মাত্রা কমে যায়। এভাবে রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

রক্তচাপ পড়ে গেলে (যেমন—মানসিক আঘাতে) ক্যারোটিড ও অ্যাওটিক ব্যারোরিসেপ্টর থেকে সংকেত যথাক্রমে গ্লোফ্যারিজিয়াল ও ভ্যাগাস স্নায়ুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেডুলা অবলংগাটায় জড়ে হয়। মেডুলা অবলংগাটা তথ্যগুলো হৃৎপিণ্ড, কার্ডিয়াক পেসমেকার, দেহের ধমনিকা বা আর্টেরিওল (ধমনির সূচু শাখা) ও শিরায় প্রেরণ করে। ফলে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয় ও সজোরে সঞ্চুচিত হয় এবং ধমনির রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

→ MAT: 18-19

**২. নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর বা আয়তন রিসেপ্টর (Low-Pressure Baroreceptors or Volume Receptors):**

বড় বড় সিস্টেমিক শিরা, পালমোনারি রক্তবাহিকা এবং ডান অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরের ব্যারোরিসেপ্টরগুলো এ ধরনের। এসব রিসেপ্টর **রক্তের আয়তন** (blood volume) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। রক্তের আয়তন কমে গেলে রক্তচাপও কমে যায়। তখন আয়তন রিসেপ্টর মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস-এ বার্তা প্রেরণ করে। ফলে পিটুইটারি গ্রস্তির নিউরোহাইপোফাইসিস কর্তৃক অ্যান্টিডাইট্রেটিক হরমোন বা ভ্যাসোপ্রেসিন ক্ষরণ বেড়ে যায়। উক্ত হরমোন বৃক্তনালিকায় পানি পুনঃশোষণ বাড়িয়ে রক্তের আয়তন বৃদ্ধির মাধ্যমে রক্তচাপ বাড়ায়। ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন সরাসরি রক্তনালিকার সঙ্গে ঘটিয়েও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। রক্তের আয়তন তথা চাপ কমে গেলে স্বয়ংক্রিয় বা সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উদ্বিষ্ট হওয়ায় বৃক্তের অঙ্গরাহী ধমনির জাঙ্কটা-গ্লোমেরুলার কোষ (juxtaglomerular cell) থেকে রেনিন (renin) এনজাইম ক্ষরণ বেড়ে যায়। রেনিন এনজাইমের কার্যকারিতায় কয়েকটি জটিল বিক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তের আয়তন বাড়িয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ আয়তন রিসেপ্টরের প্রভাব রয়েছে রক্ত সংবহন ও রেচন উভয় তন্ত্রে।

**মানবদেহের রক্ত সংবহন (Blood Circulation of Human Body)**

**মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র বন্ধ ধরনের (closed type)**। অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিক নালিক মাধ্যমে সম্পূর্ণাত্মক হয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবহন সম্পন্ন করে। তাছাড়া মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রে **দ্বি-চক্রীয় সংবহন** (double circulation) অর্থাৎ সিস্টেমিক (systemic) ও পালমোনারি (pulmonary) চক্র দেখা যায়। মানবদেহে চার প্রক্রিয়ায় রক্তসংবহন সংঘটিত হয়, যথা - ১. সিস্টেমিক, ২. পালমোনারি, ৩. পোর্টাল এবং ৪. করোনারি। নিচে এসব প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

**১. সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation)**

যে সংবহনে রক্ত বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বিভিন্ন রক্ত বাহিকার মাধ্যমে অঙ্গগুলোতে পৌছায় এবং অঙ্গ থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে সিস্টেমিক সংবহন বলে। সব সিস্টেমিক ধমনির উত্তর হয় **অ্যাওর্টা** (aorta) বা মহাধমনি থেকে, আর অ্যাওর্টার উত্তর ঘটে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ঘটে ফলে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত প্রথমে অ্যাওর্টার ভিতর দিয়ে ধমনিতে প্রবেশ করে। পরে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গের ধমনিকা (arteriole) ও কৈশিকনালির (capillaries) রক্ত জালিকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। জালিকা থেকে রক্ত পুনরায় সংগৃহীত হয়ে উপশিরার মাধ্যমে শিরায় প্রবেশ করে। সব শিরার রক্ত পরে সুপরিয়িয়ার ভেনাক্যাভা (উর্ধ্ব মহাশিরা) ও ইনফিয়িরিয়ার ভেনাক্যাভা (নিম্ন মহাশিরা) দিয়ে হৃৎপিণ্ডের **ডান অ্যাট্রিয়ামে** প্রবেশ করে। ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে গমন করে। এভাবে সিস্টেমিক সংবহন সমাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসতে সিস্টেমিক সংবহনের সময় লাগে ২৫-৩০ সেকেন্ড। → MAT: 09-10

**কাজ :** সিস্টেমিক সংবহনে রক্ত দেহকোষের চারপাশে অবস্থিত কৈশিকজালিকা অতিক্রমকালে কোষে  $O_2$ , খাদ্যসারসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে এবং একই সাথে কোষে সৃষ্টি  $CO_2$ , রেচন পদার্থ ইত্যাদি কোষ থেকে অপসারিত হয়।

বাম ভেন্ট্রিকল → অ্যাওর্টা → টিস্যু ও অঙ্গ → মহাশিরা (ভেনাক্যাভা) → ডান অ্যাট্রিয়াম → ডান ভেন্ট্রিকল।

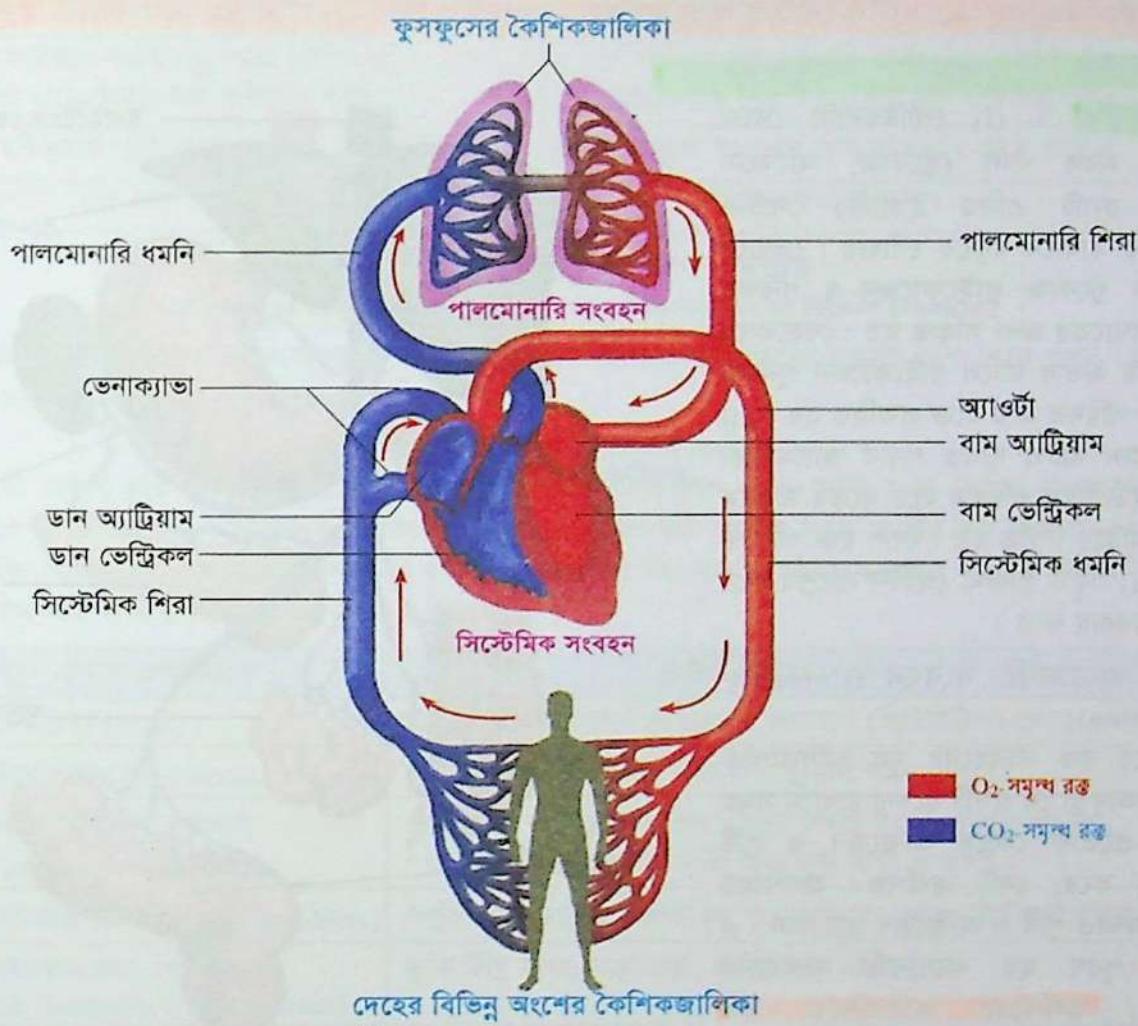
**২. পালমোনারি সংবহন (Pulmonary circulation)**

যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে পৌছায় এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে পালমোনারি বা ফুসফুসীয় সংবহন বলে। পালমোনারি সংবহনের শুরু হয় পালমোনারি ধমনি থেকে, আর পালমোনারি ধমনির উত্তর ঘটে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে। ডান ভেন্ট্রিকলের সঙ্গে ঘটে কার্বন ডাইঅক্সাইড-সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে প্রবেশ করে। এরপর রক্ত ধমনিকা (arteriole) হয়ে ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের চারপাশে অবস্থিত

কৈশিকনালিতে উপস্থিত হয়। কৈশিকনালি থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পুনরায় ক্ষুদ্রতর শিরা বা ভেনিউল (venule) এবং অবশেষে ৪টি (প্রতি ফুসফুস থেকে ২টি) পালমোনারি শিরার মাধ্যমে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে।

**ডান ভেনিউল** → পালমোনারি ধমনি → ফুসফুস → পালমোনারি শিরা → বাম অ্যাট্রিয়াম → বাম ভেনিউল ] MAT: 15-16

**কাজ :** এ সংবহনের মাধ্যমে  $\text{CO}_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে। সেখানে অ্যালভিওলাসে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটে ফলে  $\text{O}_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।



### ৩. পোর্টাল সংবহন (Portal circulation)

সিস্টেমিক ও পালমোনারি এ দুটি সম্পূর্ণ সংবহন চক্র ছাড়াও মেরুদণ্ডী প্রাণীতে রক্ত চলার পথে কিছুটা পার্শ্বপথ অনুসরণ করে। এসব ক্ষেত্রে কোনো অঙ্গের কৈশিকজালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় জালিকায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের রক্ত সংবহনকে পোর্টাল সংবহন বলে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সাধারণত হেপাটিক (hepatic) এবং রেনাল (renal)-এ দুধরনের পোর্টাল সংবহন দেখা যায়। তবে রেনাল পোর্টাল সংবহন মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অনুপস্থিত।

**হেপাটিক (যকৃত) পোর্টাল সংবহন:** পাকস্থলি, ক্ষুদ্রাশ্র, অগ্ন্যাশয়, অস্ত্র ও প্রীহা থেকে কৈশিকজালিকার মাধ্যমে সংগৃহীত রক্ত হেপাটিক পোর্টাল শিরা (hepatic portal vein)-র ভিতর দিয়ে যকৃতের দিকে প্রবাহিত হওয়াকে হেপাটিক পোর্টাল সংবহন বলে। যকৃতে পৌছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা পুনরায় কৈশিকজালিকায় বিভক্ত হয়। এসব কৈশিকজালিকা পরে একত্রিত হয়ে হেপাটিক শিরা (hepatic vein) গঠন করে এবং এর মাধ্যমে রক্ত ইনফিল্রিয়ের ভেনাক্যাভায় বাহিত হয়। সেখান থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌছায়।

পৌষ্টিক অঙ্গসমূহ → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃত → হেপাটিক শিরা → ইনফিল্রিয়ের ভেনাক্যাভায় → হৃৎপিণ্ড।

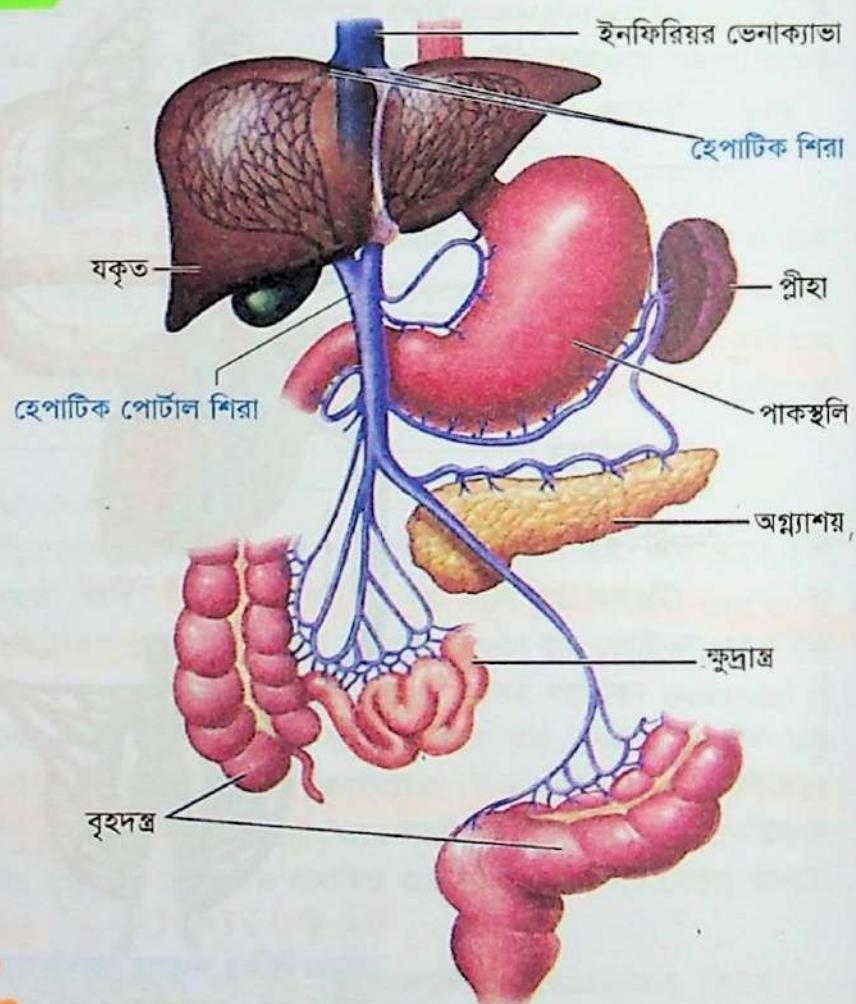
**হেপাটিক পোর্টাল সংবহনের প্রয়োজনীয়তা :** (i) পৌষ্টিকনালি থেকে শোষিত সরল খাদ্য (গুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ইত্যাদি) পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে পৌছায়। সেখানে অতিরিক্ত গুকোজ গ্লাইকোজেন-এ পরিণত হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত হয়। দেহকোষে গুকোজের অভাব ঘটলে গ্লাইকোজেন পুনরায় গুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয়। (ii) নাইট্রোজেন ঘটিত দূষিত পদার্থ অ্যামোনিয়া যকৃতে ইউরিয়ায় পরিণত হয়ে বৃক্কের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়। ফলে রক্ত পরিশুম্বন্ধ হয়। (iii) যকৃত প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ করে রক্তে সরবরাহ করে।

#### ৮. করোনারি সংবহন (Coronary circulation)

দেহে রক্ত সংবহনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আমৃত্যু যে অঙ্গটি রক্তের মাধ্যমে সমগ্র দেহের প্রত্যেক কোষে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে, সেটি হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ডের নিজের জন্যও পুষ্টি ও অক্সিজেন প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণ হয় করোনারি সংবহনের মাধ্যমে। **হৃৎপিণ্ডের হৃৎপেশিতে রক্ত সংবাহনকারি সংবহনকে করোনারি রক্ত সংবহন বলে।**

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃৎগহ্বর থেকে রক্ত সংবাহনকারি সংবাহনকারি সংবহনের প্রাচীরে  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত সংবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর থেকে  $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।

সিস্টেমিক ধমনি → করোনারি ধমনি → হৃৎপ্রাচীর → করোনারি শিরা → ডান অ্যাট্রিয়াম।



চিত্র ৪.২৮ : হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র

### সিস্টেমিক এবং পালমোনারি সংবহনে পার্থক্য

সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation)	পালমোনারি সংবহন (Pulmonary circulation)
১. রক্তের গতিপথ বাম ভেন্ট্রিকল থেকে দেহটিস্যু এবং দেহটিস্যু থেকে ডান অ্যাট্রিয়াম।	১. রক্তের গতিপথ ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুস এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়াম।
২. বাম ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু হয়ে দেহটিস্যু অতিক্রম করে ডান অ্যাট্রিয়ামে শেষ হয়।	২. ডান ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু হয়ে ফুসফুস অতিক্রম করে বাম অ্যাট্রিয়ামে শেষ হয়।
৩. এ সংবহনে ধমনি $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত এবং শিরা $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।	৩. এ সংবহনে পালমোনারি ধমনি $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত ও পালমোনারি শিরা $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।
৪. দেহটিস্যুতে পুষ্টি সরবরাহ করে।	৪. অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য ফুসফুসে গমন করে।
৫. রক্তচাপ বেশি।	৫. রক্তচাপ তুলনামূলকভাবে কম।

### হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয়

**(Measures to be taken in different conditions of Heart Disease)**

বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষের হৃৎপিণ্ডে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। হৃৎপিণ্ডের সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য কারণেও বুকে ব্যথা হতে পারে।

#### বুকের ব্যথা (Chest Pain)

নানা কারণে বুকে ব্যথা হতে পারে। সাধারণত মানুষের কাছে বুকে ব্যথার অর্থই হচ্ছে কোনো না কোনো ধরনের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া। চিকিৎসকও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি আমলে নিয়ে রোগীর কষ্ট উপরয়ে সচেষ্ট হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, হৃদরোগসংক্রান্ত বুক ব্যথা নয়, ব্যথা ভিন্ন কারণে। নিচে হৃদরোগ বহির্ভূত কয়েকটি সাধারণ বুক ব্যথার নাম ও কারণ উল্লেখ করা হলো।

বুক ব্যথার প্রকারভেদ	লক্ষণ / কারণ
১. প্লিউরিসি (Pleurisy)	ভাইরাসের সংক্রমণে ফুসফুসের আবরণে (প্লিউরিটিস) প্রদাহ।
২. নিউমোনিয়া (Pneumonia)	ফুসফুসে ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ; প্ল্যারাল যন্ত্রণা।
৩. পালমোনারি এমবোলিজম (Pulmonary embolism)	শ্বেণিদেশ বা নিম্নাঞ্জের শিরা থেকে জমাট রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ; পালমোনারি ইনফার্কশন সৃষ্টি; তীব্র বুক ব্যথা ও কাশি।
৪. কস্টোকন্ড্রাইটিস (Costochondritis)	পর্শুকা ও বক্ষাস্ত্রির তরঙ্গাস্ত্রির সংযোগস্থলে প্রদাহ; দীর্ঘকালীন বুক ব্যথা।
৫. পর্শুকার ভাঙ্গন, পেশিটান (Rib fractures, Muscle strain)	বুকে তীব্র ব্যথা; নড়া-চড়া, কাশি দেয়া কষ্টকর।
৬. ন্যায়ুতে চাপ (Nerve compression)	ন্যায়ুম্লে হাড়ের চাপ; বুকে উর্ধ্ববাহতে ব্যথা।
৭. পিন্ট পাথুরি (Gall stones)	পিন্টথলিতে পাথর হলে বুক, ঠিঠ ও উদরের উপরের অংশে ব্যথা।
৮. দুশিতা ও আতঙ্কগন্ত (Anxiety and Panic Attacks)	দুশিতা, অবসন্নতা ও আতঙ্কগন্ত হলে কয়েক মিনিট থেকে কয়েকদিন বুকে ব্যথা; ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, মাথা ঝুঁমিয়া করা, হতবুদ্ধি হওয়া।

#### কার্ডিওভাস্কুলার রোগ (Cardiovascular disease) বা হৃদরোগ (Heart disease)

হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালির রোগকে কার্ডিওভাস্কুলার রোগ বলা হয়। কার্ডিওভাস্কুলার রোগকে হৃদরোগ-ও বলে। কার্ডিওভাস্কুলার রোগ বা হৃদরোগ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো করোনারি ধমনি রোগ বা করোনারি হৃদরোগ, কার্ডিওমেগালি (cardiomegaly; হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া), হার্ট ভালভ রোগ (heart valve disease; এক বা একাধিক

হৃদকপাটিকা অকার্যকর), কনজেনাইটাল হার্ট ডিজিজ (congenital heart disease; জন্মকালে হৎপিণ্ডে বিকলান্দতা), পেরিকার্ডিইটিস (pericarditis; পেরিকার্ডিয়ামের স্ফীতি), কার্ডিওমায়োপ্যাথি (cardiomyopathy; হৎপেশির রোগ), রিউম্যাটিক হৃদরোগ (rheumatic heart disease; স্ট্রেপ্টোককাস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্টি রিউম্যাটিক জ্বর এর কারণে হৎপেশি এবং ভালভ এর রোগ) ইত্যাদি।

কার্ডিওভাস্কুলার রোগের মধ্যে অন্যতম হলো করোনারি হৃদরোগ (coronary heart disease)। হৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহকারী করোনারি ধমনির সংকীর্ণতার ফলে হৎপেশিতে পৃষ্ঠি এবং অক্সিজেন সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে করোনারি হৃদরোগ বলে। করোনারি হৃদরোগের অপর নাম ইশ্কিমিয়া (ischaemia)। অ্যানজাইনা, হার্ট অ্যাটাক এবং হার্ট ফেলিওর করোনারি ধমনির অস্বাভাবিকতার কারণে সৃষ্টি করোনারি হৃদরোগ।

কার্ডিওভাস্কুলার রোগ তথা করোনারি হৃদরোগ এর প্রধান কারণ হলো ধমনি সরঁ হয়ে যাওয়া। ধমনি সরঁ হয় অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস (atherosclerosis) দ্বারা। অধিক কোলেস্টেরল সম্পন্ন হলুদ ফ্যাটি এসিড ক্যারোটিড ধমনির এন্ডোথেলিয়াম-এর গাত্রে জমা হয়ে অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস এর শুরু হয়। পরে কোলেস্টেরলে আঁশ যুক্ত হয়ে এবং শক্ত হয়ে প্লাক (plaque) সৃষ্টি করে। প্লাক আকৃতিতে বৃদ্ধি পেয়ে ধমনি গহ্বরকে সরঁ করে এবং রক্ত চলাচালে বাধা সৃষ্টি করে।

### ১. অ্যানজাইনা (Angina) বা হৃদশূল

নানা কারণে বুকে ব্যথা হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হৎপিণ্ডজনিত বুক ব্যথা। হৎপেশি যখন  $O_2$ -সমৃদ্ধ পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ পায় না তখন বুক নিষ্পেষিত হচ্ছে বা দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন মারাত্মক অস্বস্তি অনুভূত হলে সে ধরনের বুক ব্যথাকে অ্যানজাইনা বা অ্যানজাইনা পেকটোরিস (angina / angina pectoris) বলে। অ্যানজাইনাকে সাধারণত হার্ট অ্যাটাকের পূর্ববস্থা মনে করা হয়।

#### অ্যানজাইনার প্রকার (Types of Angina)

সাধারণত তিনি ধরনের অ্যানজাইনা হয়ে থাকে, যথা-

- সুস্থিত অ্যানজাইনা (Stable Angina) :** এক্ষেত্রে বুকের ব্যথা অনুভূত হয় কেবল পরিশ্রম কিংবা চরম আবেগীয় বিষন্নতার কারণে। বিশ্রাম নিলে এ ব্যথা চলে যায়।
- অস্থিত অ্যানজাইনা (Unstable Angina) :** বিশ্রামের সময় বুকের ব্যথা অনুভূত হলে তাকে অস্থিত অ্যানজাইনা বলা হয়। এ ব্যথা প্রায়শই হয়ে থাকে এবং অনেক সময়ব্যাপি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। এ ধরনের অ্যানজাইনা হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ।
- প্রিন্জমেটাল অ্যানজাইনা (Prinzmetal Angina) :** বিশ্রামের সময় কিংবা ঘুমের সময় কিংবা ঠাণ্ডার কারণে এ ধরনের অ্যানজাইনা দেখা দেয়।

#### অ্যানজাইনার লক্ষণ (Symptoms of Angina)

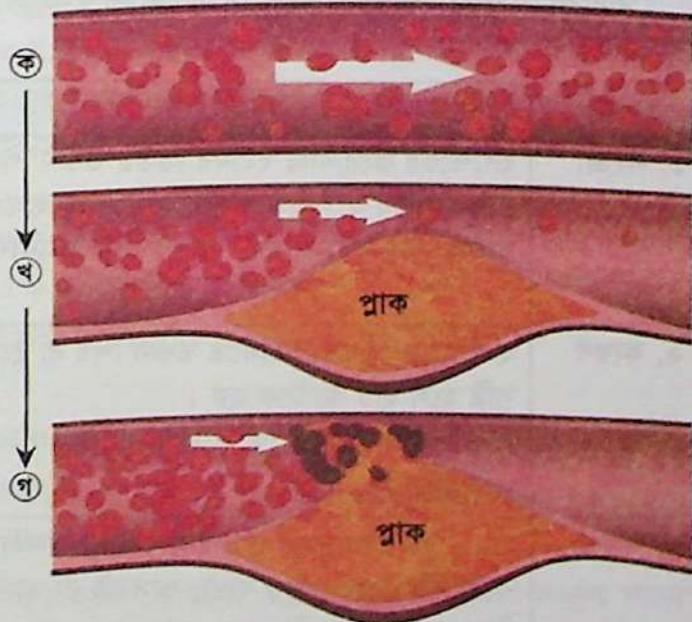
১. উরংফলক বা স্টোর্নামের (sternum) পিছনে বুকে ব্যথা হওয়া।
২. ব্যায়াম বা অন্য শারীরিক কাজে, মানসিক চাপ, অতি ভোজন, শৈত্য বা আতঙ্কে বুকে ব্যথা হতে পারে। ব্যথা ৫-৩০ মিনিট স্থায়ী হয়।
৩. অ্যানজাইনা গলা, কাঁধ, চোয়াল, বাহু, পিঠ এমনকি দাঁতেও ছড়াতে পারে।
৪. অনেক সময় ব্যথা কোথেকে আসছে তাও বোঝা যায় না।
৫. বুকে জ্বালাপোড়া, চাপ, নিষ্পেষণ বা আড়ষ্ট ভাব সৃষ্টি হয়ে অস্বস্তির প্রকাশ ঘটায়।
৬. বুকে ব্যথা ছাড়াও হজমে গভগোল ও বমি ভাব হতে পারে।
৭. ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া কিংবা দম ফুরিয়ে হাঁপানো দেখা দিতে পারে।

অনেক রোগী অ্যানজাইনা টের পায় না, তবে কাঁধ ও বাহু ভারী হয়ে আসে। বুকে ব্যথার সাথে সাথে ঘাম হয়, মাথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা উচিত। কিছু বিষয় আছে যার নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই, যেমন-বয়স, লিঙ্গভেদ, হৃদরোগ ও অ্যানজাইনার পরিবারিক ইতিহাস। যে সব বিষয় আমাদের নাগালে তার মধ্যে রয়েছে:

১. রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ECG ও ইকোকার্ডিওগ্রামের মাধ্যমে ব্যথার কারণ নির্ণয় করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ খেতে হবে।
২. রোগের অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসক অপারেশন অথবা এনজিওগ্রামের পরামর্শ দিতে পারেন।
৩. এছাড়াও ধূমপান ও মদপান পরিহার করতে হবে।
৪. নিয়মিত পরিমিত ব্যায়াম বা হাঁটা-চলা, কায়িক পরিশ্রম করা, আলস্য পরিহার, স্তুলতা রোধ করা ইত্যাদি।
৫. সুষম ও হৃদ-বান্ধব খাবার খেতে হবে।
৬. ডায়োবেটিস, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বনে অ্যানজাইনাল ব্যথার সম্ভাবনা কমে।

## ২. হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack or Myocardial Infarction)

হৃৎপেশির সুস্থতার জন্য ক্রমাগতভাবে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ জরুরি। করোনারি ধমনির মাধ্যমে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত পেশিতে পৌছায়। চর্বি জাতীয় পদার্থ, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন প্রভৃতি করোনারি ধমনির অস্তর্গাত্রে জমা হয়ে বিভিন্ন আকৃতির প্লাক (plaques) গঠন করে। একে করোনারি অ্যাথেরোমা (coronary atheroma) বলে। প্লাকের বহির্ভাগ ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠে। এভাবে প্লাক শক্ত হতে হতে যখন চরম পর্যায়ে পৌছায় তখন এগুলো বিদীর্ণ হয়। অণুচ্ক্রিকা জমা হয়ে প্লাকের চতুর্দিকে তখন রক্ত জমাট বাঁধাতে শুরু করে। রক্ত জমাট বাঁধার কারণে করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে হৃৎপেশিতে পুষ্টি ও অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়, ফলে হৃৎপেশি ধ্বংস হয় বা মরে যায় এবং মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর নাম হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (myocardial infarction; ‘মায়োকার্ডিয়াল’ অর্থ হৃৎপেশি, আর ‘ইনফার্কশন’ অর্থ অপর্যাপ্ত রক্ত প্রবাহের কারণে টিস্যুর মৃত্যু)।



চিত্র ৪.২৯ : প্লাক গঠন

### হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ

করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল জাতীয় পদার্থ জমা হওয়া থেকে হার্ট অ্যাটাকে পরিসমাপ্তি হওয়া পর্যন্ত অনেক দিন অতিবাহিত হয়। এ সময়ের ভিতর বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

১. বুকে ব্যথা (Chest-pain) : বুকের ঠিক মাঝখানে অস্থিতি হওয়া যা কয়েক মিনিট থাকে, চলে যায় আবার ফিরে আসে। বুকে অসহ্য চাপ, মোচড়ান, আচড়ান বা ব্যথা অনুভূত হয়।

২. উর্ধ্বাঙ্গের অন্যান্য অংশে অস্থিরি (Discomfort in other areas of the upper body) : এক বা উভয় বাহু, পিঠ, গলা, চোয়াল বা পা উপরের অংশে অস্থিরি বা ব্যথা অনুভব।
৩. ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস (Shortness of breath) : বুকে অস্থিরির সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘটে। অনেক সময় বুকে অস্থিরি হওয়ার আগেও এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে।
৪. বমি-বমি ভাব (Nausea) বা বমি হওয়া : পাকস্থলিতে অস্থিরির সঙ্গে বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, হঠাৎ মাথা ঝিমঝিম করা অথবা ঠাণ্ডা ঘাম বেরিয়ে যাওয়া।
৫. শুয়ে ব্যাঘাত (Sleep disturbance) : শুয়ে ব্যাঘাত ঘটা, নিজেকে শক্তিহীন বা শ্রান্ত বোধ করা।

### প্রতিরোধ

১. ঝুতুকালীন টাটকা ফল ও সবজি খেতে হবে।
২. চর্বি ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে।
৩. বডি-মাস ইন্ডেক্স (Body Mass Index, BMI) মেনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।
৪. সঠিক ওজন, রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম (যেমন- **প্রতিদিন ৩০ মিনিট ইঁটা ইত্যাদি**) করতে হবে।
৫. ধূমপায়ী হলে অবশ্যই ধূমপান ত্যাগ করতে হবে, অধূমপায়ী হলে ধূমপান না করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।
৬. জীবনাভ্যাসে অ্যালকোহল নিষিদ্ধ রাখতে হবে।
৭. কোলেস্টেরল, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
৮. চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে বা বদ্ধ করতে হবে।
৯. বছরে অস্তত একবার (সম্ভব হলে দুবার) সমগ্র দেহ চেকআপের ব্যবস্থা করতে হবে।

### হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক

সাধারণ মানুষের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক সম্পর্কে পরিকার ধারণা নেই। অনেক সময় দুটোকে এক করে দেখা হয়। নিচে এদের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো।

বিষয়	হার্ট অ্যাটাক	স্ট্রোক
১. সংজ্ঞা	হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনির ভিতর তক্ষন পিণ্ড বা ব্লকেজ সৃষ্টির ফলে রক্ত সরবরাহ না পেয়ে হৃৎপেশি মরে যাওয়ায় যে দুর্ঘটনা ঘটে তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে।	মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী কোনো ধমনির (যেমন-ক্যারোটিড ধমনি) ভিতরে তক্ষন পিণ্ড বা ব্লকেজ সৃষ্টির ফলে যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাকে স্ট্রোক বলে।
২. কারণ	হৃৎপিণ্ডের কোনো ধমনিতে তক্ষন পিণ্ড বা ব্লকেজ সৃষ্টি হলে হার্ট অ্যাটাক হয়।	মস্তিষ্কের কোনো ধমনিতে তক্ষন পিণ্ড বা উচ্চ রক্তচাপের দরঘন মস্তিষ্কের কোনো ধমনি ফেটে গেলে অথবা মস্তিষ্কের কোনো ধমনির অনিয়ন্ত্রিত সঙ্কোচন বা আপেক্ষের কারণে স্ট্রোক হয়।
৩. লক্ষণ	হার্ট অ্যাটাকের ফলে বুকের মাঝখানে অসহ্য চাপ বা অস্থিরি, বুকে প্রচও ব্যথা, শ্বাসকষ্ট বা দমবন্ধনা, শীতল ঘাম, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।	স্ট্রোকের ফলে শৃতিভ্রংশ, বাকলোপ, চেতনালোপ, প্যারালাইসিস, নাক ও মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ, এমনকি আকস্মিক মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
৪. চিকিৎসা	ডাক্তারের পরামর্শ মতো কার্যকর ওষুধ সেবন করা। এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি ইত্যাদি হলো হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা।	ডাক্তারের পরামর্শ মতো কার্যকর ওষুধ সেবন করা। প্যারালাইসিসের ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি নেয়া ইত্যাদি হলো স্ট্রোকের চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা।

### ৩. হার্ট ফেইলিউর (Heart Failure)

হৃৎপিণ্ড যখন দেহের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত রক্তের যোগান দিতে পারে না তখন এ অবস্থাকে হার্ট ফেইলিউর বলে। অনেক সময় হৃৎপিণ্ড রক্তে পরিপূর্ণ হতে না পারায়, কখনওবা হৃৎপ্রাচীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকায় এমনটি হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে উভয় সমস্যাই একসঙ্গে দেখা যায়। অতএব হার্ট ফেইলিউর মানে হৃৎপিণ্ড বঙ্গ হয়ে গেছে, বা থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তা নয়। তবে হার্ট ফেইলিউরকে হৃৎপিণ্ডের একটি মারাত্মক অবস্থা বিবেচনা করে সুচিকিৎসার কথা বলা হয়েছে।

#### হার্ট ফেইলিউরের কারণ

বিভিন্ন কারণে হার্ট ফেইলিউর হতে পারে। যেমন-

১. হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের জন্য।
২. উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশনের জন্য।
৩. হৃৎপিণ্ডের কপাটিকার রোগ হলে।
৪. ইসকেমিক হৃদরোগ হলে অর্থাৎ করোনারি ধমনিতে ব্লক হলে।
৫. হৃৎস্পন্দনের ছন্দোপতন হলে।
৬. অতিমাত্রায় রক্ত শূন্যতার জন্য।
৭. ধূমপান ও মদ্যপানের জন্য।
৮. অত্যধিক মানসিক চাপ, বার্ধক্যজনিত কারণে, জেনেটিক কারণে ইত্যাদি।

#### হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ

১. সক্রিয়, নিক্রিয় এমনকি ঘুমের মধ্যেও শ্বাসকষ্টে ভোগা এবং ঘুমের সময় মাথার নিচে দুটি বালিশ না দিলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।
২. সাদা বা গোলাপি রঙের রক্তমাখানো মিউকাসসহ স্থায়ী কাশি বা ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস-প্রশ্বাস।
৩. শরীরের বিভিন্ন জায়গার টিস্যুতে তরল জমে ফুলে উঠে।
৪. পা, গোড়ালি, পায়ের পাতা, উদর ও যকৃত স্ফীত হয়ে যায়। জুতা পরতে গেলে হঠাৎ আঁটসাট মনে হয়।
৫. প্রতিদিন সব কাজে, সবসময় ক্লান্তিভাব। বাজার-সদাই করা, সিঁড়ি দিয়ে উঠা, কিছু বহন করা বা হাঁটা সবকিছুতেই শ্রান্তিভাব।
৬. পাকস্থলি সব সময় ভরা মনে হয় কিংবা বমি ভাব থাকে।
৭. হৃৎস্পন্দন এত দ্রুত হয় মনে হবে যেন হৃৎপিণ্ড এক প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
৮. কাজ-কর্ম, চলনে অসামঞ্জস্যতা এবং স্মৃতিহীনতা প্রকাশ পায়।

#### হার্ট ফেইলিউরের প্রতিকার

অসুখের শুরুতেই হার্ট ফেইলিউরের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হলে এবং প্রতিকার সম্বন্ধে সতর্ক হলে রোগীর তেমন সমস্যা থাকে না, সক্রিয় জীবন যাপনেও কোনো কিছু বাধা হয় না। **হার্ট ফেইলিউরে আক্রান্ত রোগীদের সাধারণত ৩ ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা হয়।**

১. **জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন :** স্বাস্থ্যসম্মত আহার হচ্ছে রোগীদের প্রধান অবলম্বন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্য তালিকা দেখে নিয়মিত সুষম পানাহার করা উচিত।
২. **ওষুধ গ্রহণ :** হার্ট ফেইলিউরের ধরন দেখে চিকিৎসক যে সব ওষুধ নির্বাচিত করবেন নিয়মিত তা সেবন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে।
৩. **অন্যান্য চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া :** হার্ট ফেইলিউর যেন খারাপের দিকে মোড় না নেয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন শারীরিক অব্যবস্থাপনা সারিয়ে তুলতে হবে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যেমন- শরীরের ওজন বেড়ে

যাওয়ার অর্থ হচ্ছে টিস্যুতে পানি জমে থাকা। চিকিৎসককে বলতে হবে কখন ওজন পরীক্ষা করাতে হবে এবং ওজন পরিবর্তন সম্মতে বি  
রিপোর্ট করতে হবে।

উল্লিখিত তিটি প্রতিকার পদ্ধতিতে কাজ না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী শল্যচিকিৎসা বা অন্য কোনো ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

### করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ (Risk Factors of Coronary Heart Disease)

১. বয়স : বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ধমনির সংকীর্ণতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
২. লিঙ্গ : পুরুষেরা সাধারণত করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকিতে থাকে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনোপজের পর ঝুঁকি বাড়ে।
৩. পারিবারিক ইতিহাস : হৃদরোগের পারিবারিক ইতিহাস রোগ সৃষ্টির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। **বিশেষত বাবা বা ভাই** এর ক্ষেত্রে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকি থাকে। তবে **মা বা বোনের** ক্ষেত্রে ৬৫ বৎসর বয়সের মধ্যে ঝুঁকি থাকে।
৪. ধূমপান : নিকোটিন রক্তনালির সঙ্কোচন ঘটায় এবং CO রক্তনালির অস্তঃপর্দাকে নষ্ট করে দেয়। ফলে অ্যাথেরোস্কেরোসিস (atherosclerosis) এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।
৫. উচ্চ রক্তচাপ : নিয়ন্ত্রণহীন উচ্চ রক্তচাপের কারণে রক্তনালির পুরুত্ব বাড়ে এবং ঝজুতা বৃদ্ধি পায় ফলে নালির সংকীর্ণতা ঘটে।
৬. কোলেস্টেরলের উচ্চমাত্রা : রক্ত কোলেস্টেরলের উচ্চমাত্রা অ্যাথেরোস্কেরোসিস (atherosclerosis) সৃষ্টি করে।
৭. ডায়াবেটিস : ডায়াবেটিস করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।
৮. শূলতা : শূলতা বা স্বাভাবিকের চেয়ে দেহের ওজন বৃদ্ধি পেলে ঝুঁকি বাড়ে।
৯. শারীরিক নিষ্ঠিয়তা : শারীরিকভাবে নিষ্ঠিয় থাকলে রোগের ঝুঁকি বাড়ে।
১০. বিকিরণ চিকিৎসা : ক্যাসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রেডিয়েশন হৃদরোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

### হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা (The Concept of the Treatment of Heart Diseases)

#### হৃদরোগ নির্ণয়

নিচে বর্ণিত উপায়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হৃদরোগ নির্ণয় করতে পারেন।

১. চিকিৎসকগণ হার্ট বিটের হার বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের অস্থাভাবিক শব্দ, পা ফুলে যাওয়া, ঘাড়ের শিরা ফুলে যাওয়া, যকৃত বড় হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখে হৃদরোগ সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।
২. বুকের X-ray করানোর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা জানা যায়। → **MAT: 16-17**
৩. ইসিজি (Electrocardiogram) হৃৎপিণ্ডের **প্রাথমিক** রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।
৪. ইটিটি (Exercise Tolerance Test)-র সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বা কার্যক্ষমতা ভালোভাবে জানা যায়।
৫. রক্তের BNP (Brain Natriuretic Peptide) পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।
৬. **করোনারি এনজিওগ্রাম**-এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে কোনো ব্লক আছে কিনা তা দেখা হয়।
৭. হৃৎপিণ্ডের পেশির অবস্থা জানা যায় MRI (Magnetic Resonance Imaging) পরীক্ষার মাধ্যমে।
৮. উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ নির্ণয়ের পরীক্ষা করে হৃদরোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
৯. হার্ট অ্যাটাক হলে Troponin-I পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়।

DAT:  
16-17

আধুনিক বিশ্বে হৃদরোগের গবেষণার ফসল হিসেবে বেশ কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। নিচে এমন কয়েকটি চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

### ১. হৃদস্পন্দক বা পেসমেকার (Pacemaker)

হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়াম-প্রাচীরের উপর দিকে অবস্থিত, বিশেষায়িত কার্ডিয়াক পেশিগুচ্ছে গঠিত ও স্বয়ংক্রিয় স্থায়ুতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত একটি ছোট অংশ যা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহ ছড়িয়ে দিয়ে হৃদস্পন্দন সৃষ্টি করে এবং স্পন্দনের ছন্দোময়তা বজায় রাখে তাকে হৃদস্পন্দক বা পেসমেকার বলে। **মানুষের হৃৎপিণ্ডে সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (sino-atrial node)** হচ্ছে পেসমেকার। এটি অকেজো বা অসুস্থ হলে হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কম্পিউটারাইজড বৈদ্যুতিক যন্ত্র দেহে স্থাপন করা হয় তাকেও পেসমেকার বলে। অতএব, **পেসমেকার দুধরনের**—একটি হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশকূপী সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (SA নোড) যা প্রাকৃতিক পেসমেকার নামে পরিচিত; অন্যটি হচ্ছে যান্ত্রিক পেসমেকার, এটি অসুস্থ প্রাকৃতিক পেসমেকারকে নজরদারির মধ্যে রাখে। প্রাকৃতিক পেসমেকারের কার্যক্রম কার্ডিয়াক চক্রের অধীনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা ব্যাখ্যায় যান্ত্রিক পেসমেকার কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

#### যান্ত্রিক পেসমেকার কার্যক্রম (Artificial Pacemaker Activities)

অসুস্থ ও দুর্বল হৃৎপিণ্ডে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করে স্বাভাবিক স্পন্দন হার ফিরিয়ে আনার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বুকে বা উদরে চামড়ার নিচে স্থাপিত ছোট এক বিশেষ যন্ত্রকে পেসমেকার বলে। দেহকে সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে হলে হৃৎপিণ্ডের সুস্থিতা বজায় ও নিয়ন্ত্রণে রাখা একান্ত জরুরী। হৃৎপিণ্ডের সুস্থিতা পরিমাপের প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে হৃৎস্পন্দনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। **হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর লয় বা দ্রুত গতিসম্পন্ন** কিংবা অনিয়ত হলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক স্পন্দন হলে তাকে অ্যারিথমিয়া (arrhythmia) বলে। এমন অবস্থায় মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় বা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে। প্রচল অ্যারিথমিয়ার দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে, মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। পেসমেকার ব্যবহারে সব ধরনের অ্যারিথমিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বাকি জীবন সক্রিয় থাকা যায়। **দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানী William Chardack এবং Wilson Greatbatch, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে** দেহে স্থাপনযোগ্য পেসমেকার আবিক্ষার করেন।

#### যান্ত্রিক পেসমেকারের গঠন → MAT: 16-17

একটি **লিথিয়াম ব্যাটারি**, কম্পিউটারাইজড জেনারেটর ও শীর্ষে সেন্সরযুক্ত কতকগুলো তার নিয়ে একটি পেসমেকার গঠিত। সেন্সরগুলোকে ইলেক্ট্রোড (electrode) বলে। ব্যাটারি জেনারেটরকে শক্তি সরবরাহ করে। ব্যাটারি ও জেনারেটর একটি পাতলা ধাতব বাল্কে আবৃত থাকে। তারগুলোর সাহায্যে জেনারেটরকে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ইলেক্ট্রোডগুলো হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কর্মকাণ্ড শনাক্ত করে তারের মাধ্যমে জেনারেটরে প্রেরণ করে।

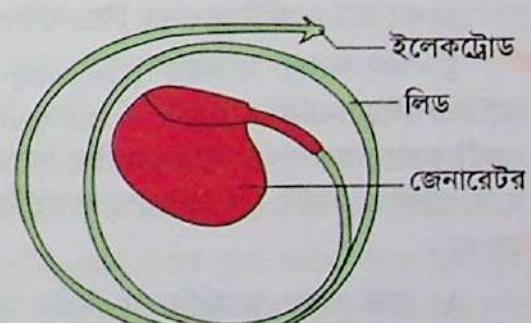
পেসমেকারে অপরিবাহী আবরণযুক্ত (insulated) ১-৩টি তার থাকে। পেসমেকারের তারকে লিড (lead) বলে। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তার (লিড) প্রবেশের ধরন অনুযায়ী পেসমেকার নিচে বর্ণিত ৩ রকম।

#### ১. এক-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার (Single-chamber pacemaker) :

এ ধরনের পেসমেকারে একটি তার বা লিড থাকে যা জেনারেটর থেকে হৃৎপিণ্ডের শুধু ডান অ্যাট্রিয়াম (অলিন্দ) বা ডান ভেন্ট্রিকল (নিলয়)-এ বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

#### ২. দ্বি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার (Dual-chamber pacemaker) :

এ ধরনের পেসমেকারে দুটি তার (লিড) থাকে যা জেনারেটর থেকে হৃৎপিণ্ডের দুটি প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

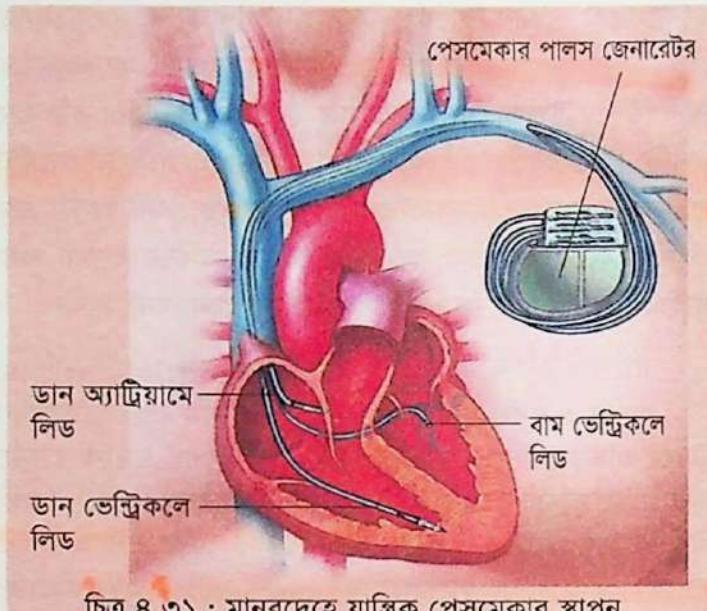


চিত্র ৪.৩০ : যান্ত্রিক পেসমেকার

**L ৩. ত্রি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার (Triple-chamber pacemaker) :** এ ধরনের পেসমেকারে তিনটি তার (লিড) থাকে যার একটি জেনারেটর থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে, আরেকটি ডান ভেন্ট্রিকলে এবং অন্যটি বাম ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে। এটি অত্যন্ত দুর্বল হৃৎপিণ্ডে স্থাপন করা হয় (না হলে হার্ট ফেইলিউরের আশঙ্কা থাকে)। পেসমেকার এক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকলদুটিকে সংকোচন ক্ষমতার উন্নতি ঘটিয়ে রক্তপ্রবাহে উন্নতি ঘটায়।

### পেসমেকার যেভাবে কাজ করে

- জেনারেটরের কম্পিউটার-চিপ এবং হৃৎপিণ্ডে যুক্ত সেপ্রেবাহী তার ব্যক্তির চলন, রক্তের তাপমাত্রা, শ্বসন ও বিভিন্ন শারীরিক কর্মকাণ্ড মনিটর করে।
- প্রয়োজনে কর্মকাণ্ডের ধারা অনুযায়ী হৃৎপিণ্ডকে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে। এসব তথ্য কাজে লাগিয়ে পেসমেকার ঠিক করে দেয় কোন ধরনের বিদ্যুৎ তরঙ্গ লাগবে এবং কখন লাগবে। যেমন-পেসমেকার ব্যক্তির ব্যায়াম করার বিষয়টি বুঝতে পেরে হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। এসব উপাস্ত পেসমেকারে রাখিত থাকে যা দেখে চিকিৎসকেরা পেসমেকারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন।
- কম্পিউটারের সাহায্যেই যেহেতু পেসমেকারের প্রোগ্রামে পরিবর্তন আনা যায় তাই পেসমেকারে ছুরি-কাঁচি চালানোর প্রয়োজন পড়ে না।
- পেসমেকারের ব্যাটারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মেয়াদ থাকে ৭-১০ বছরের মতো।



চিত্র ৪.৩১ : মানবদেহে যান্ত্রিক পেসমেকার স্থাপন  
(ত্রি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার)

## ২. ওপেন হার্ট সার্জারি (Open Heart Surgery)

- শল্যচিকিৎসক যখন রোগীর বুক কেটে উন্মুক্ত করে হৃৎপিণ্ডে অঙ্গোপচার সম্পন্ন করেন তখন সে প্রক্রিয়াকে ওপেন হার্ট সার্জারি বলে। এটি একটি বড় শল্যচিকিৎসামূলক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত অনেক জটিল সমস্যা ও রোগ মুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অন্য সব চিকিৎসার পরও যদি হৃৎপিণ্ডে বড় ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়া উপায় থাকে না। ট্রেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. Wilfred G. Bigelow, ১৯৫০ সালে সর্বপ্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি প্রয়োগ করেন।

### ওপেন হার্ট সার্জারির প্রকারভেদ

ওপেন হার্ট সার্জারি প্রধানত নিচে বর্ণিত তিনি উপায়ে করা হয়।

- L ১. অন-পাম্প সার্জারি (On-pump surgery) :** এ ধরনের সার্জারিতে একটি ~~হৃদ-ফুসফুস মেশিনে~~ যা কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস (cardiopulmonary bypass) নামে পরিচিত সেটি ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্রটি সাময়িকভাবে হৃৎপিণ্ডের কাজের দায়িত্ব নিয়ে অঙ্গীজেন-সমৃদ্ধ রক্ত পাম্প করে বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যুতে প্রেরণ করে। এটি হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ায় শল্যচিকিৎসক যখন অঙ্গোপচার করেন তখন হৃৎপিণ্ডে রক্তও থাকে না, হৃৎস্পন্দনও হয় না।

- ২. অফ-পাম্প সার্জারি বা বিটিং হার্ট (Off-pump surgery or Beating heart) :** এ ধরনের সার্জারিতে হৃদ-ফুসফুস মেশিন ব্যবহৃত হয় না, বরং চিকিৎসক সক্রিয় হৃৎস্পন্দনরত হৃৎপিণ্ডেই অঙ্গোপচার করেন। তবে হৃৎস্পন্দনের হার ওমুখ প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে সামান্য মন্ত্র করে রাখা হয়।

MAT:17-18

**৩. রোবট-সহযোগী সার্জারি (Robot-assisted surgery) :** এ ধরনের সার্জারিতে শল্যচিকিৎসক বিশেষ কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত রোবটিক হাত (যান্ত্রিক হাত)-এর সাহায্যে অঙ্গোপচার করেন। চিকিৎসক কম্পিউটার সার্জারির ত্রিমাত্রিক দৃশ্য দেখতে পান এবং কাজ সম্পন্ন করেন। এ ধরনের সার্জারি অত্যন্ত সুস্থ ও সঠিক হয়ে থাকে।

### ওপেন হার্ট সার্জারি পদ্ধতি

একজন কার্ডিওভাস্কুলার শল্যচিকিৎসকের অধীনে একটি শল্যচিকিৎসক দল ওপেন হার্ট সার্জারির মতো জটিল অঙ্গোপচার পরিচালনা করেন। সার্জারির শুরুতে চিকিৎসকের নির্দেশে সাধারণ অ্যানেস্থেসিয়া (general anesthesia) কিংবা স্নায়ুবন্ধক অ্যানেস্থেসিয়া (nerve block anesthesia) প্রয়োগ করা হয়। সার্জারি শুরু হয় বুক ও স্টোর্নাম কেটে বড়-সড় গর্ত সৃষ্টির মাধ্যমে। তা না হলে রোগীর ভিতরটা ভালোমতো দেখা যায় না। অন-পাম্প সার্জারি হলে ওমুধ প্রয়োগে হৃৎস্পন্দন বন্ধ করে দিয়ে হৃদ-ফুসফুস মেশিন (heart-lung machine)-এর সাহায্যে পাম্প করে সারা দেহে রক্তের সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়। সার্জারি শেষে মেশিন খুলে নেয়া হয়।

অন্যদিকে, করোনারি আর্টারির বাইপাস সার্জারি বা হৃৎকার্ডিওটিকা মেরামত বা পুনঃস্থাপন করার সময় সার্জন আর প্রচলিত বড় ধরনের কাটা-ছেঁড়া না করে বুকের মাঝামাঝি ছোট ফুটা করে তার ভিতরে ক্যামেরাযুক্ত যন্ত্র ঢুকিয়ে রোগীর অভ্যন্তরভাগ দেখেন মনিটরে। এ প্রক্রিয়ায় সার্জারি হলে সময় ও ব্যথা উভয়ই কম লাগে, সংক্রমণজনিত জটিলতাও কম হয়। রোগীর ব্যক্তিগত পছন্দ, শনাক্তকরণ, বয়স, অসুখের ইতিহাস, স্বাস্থ্য বুঁকি প্রভৃতির উপর এ ধরনের সার্জারি নির্ভর করে।

### সাবধানতা

জটিল কার্ডিওভাস্কুলার অসুখে ওপেন হার্ট সার্জারির স্মরণাপন হতে হয়। অন্ততঃ বাংলাদেশে এ সার্জারির খরচ মোটেও কম নয়। সার্জারির পর ভুক্তভোগীকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। যেমন-হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখে এমন আহার গ্রহণ; নিয়মিত ব্যায়াম করা; বয়স-উচ্চতার সঙ্গে মিল রেখে ওজন ঠিক রাখা; চাপ থেকে মুক্ত থাকা; ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা ছেড়ে দেয়া এবং উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিস সংক্রান্ত জটিলতা থেকে মুক্ত থাকা।

### ৩. করোনারি বাইপাস সার্জারি (Coronary Bypass Surgery)

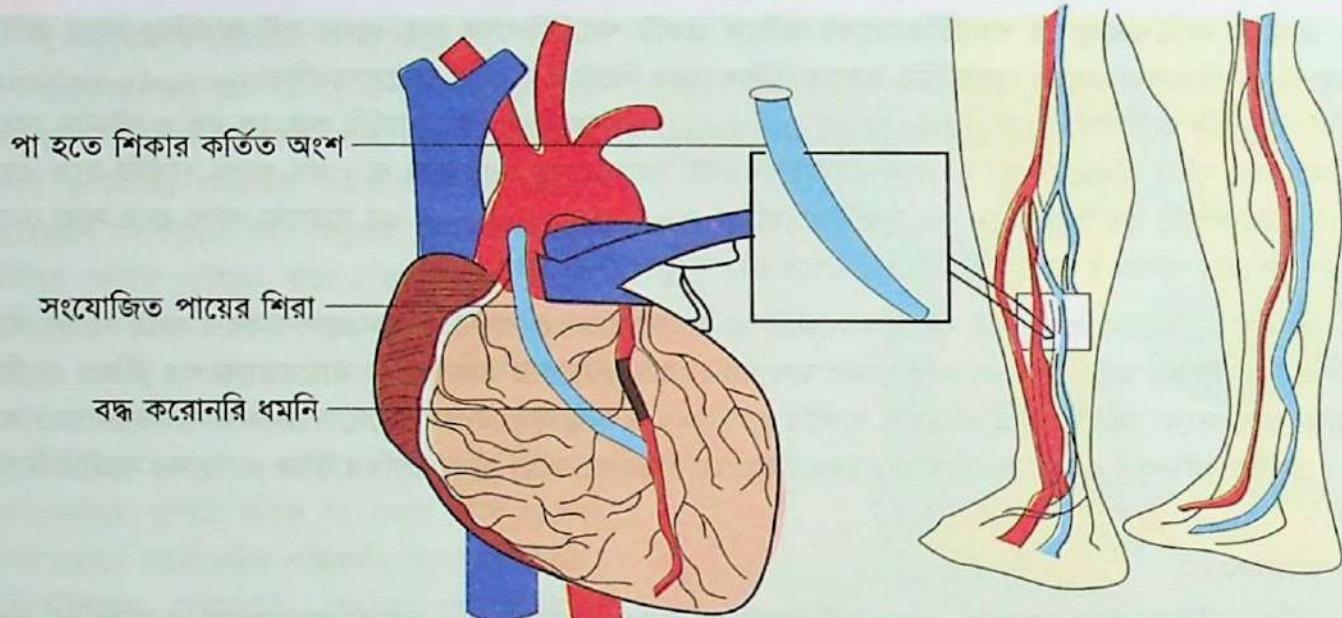
এক বা একাধিক করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) রক্ষণ হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ অব্যাহত রাখতে অঙ্গোপচারের মাধ্যমে দেহের অন্য অংশ থেকে (যেমন-পা থেকে) একটি সুস্থ রক্তবাহিকা (ধমনি বা শিরা) কেটে এনে রক্ষণ ধমনির পাশে স্থাপন করে রক্ত সরবরাহের যে বিকল্প পথ সৃষ্টি করা হয় তাকে করোনারি বাইপাস বলে। করোনারি বাইপাস সৃষ্টির সামগ্রিক অঙ্গোপচার প্রক্রিয়াটিকে করোনারি বাইপাস সার্জারি বলা হয়।

করোনারি হৃদরোগ সৃষ্টির প্রধানতম কারণ হচ্ছে করোনারি ধমনির রক্ষণতা। এর মূল কারণ ধমনির অন্তঃস্থ প্রাচীর ঘিরে ক্রমশ সঞ্চিত হওয়া উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল জাতীয় হলদে চর্বি পদার্থ। ধমনি প্রাচীরের এভোথেলিয়ামে এগুলো জমা হয়। পরে এসব পদার্থে ততু পুঞ্জিভূত হয়ে শক্ত হতে শুরু করে এবং চুনময় পদার্থে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে আর্টারিওস্ক্রেবেসিস (arteriosclerosis) বলে। আর পুঞ্জিভূত পদার্থগুলোকে বলে অ্যাথেরোমেটাস প্লাকস (atheromatous plaques)। প্লাকসের আধিক্যের কারণে ধমনিপথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং এক সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন হৃৎপেশি  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত না পেলে হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়। জীবনের প্রতি হৃমকিস্বরূপ এসব জটিলতা এড়াতে  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপেশিতে সরবরাহ করার বিকল্প পথের সৃষ্টি করতে হয়। বাইপাস সড়কের মতো হৃৎপিণ্ডে বাইপাস ধমনি নির্মাণের জটিল প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হয়।

ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি ও ডায়াবেটিস প্রভৃতি ধমনি গাত্রে প্লাক জমার কাজ ত্বরান্বিত করে। তা ছাড়া, ৪৫ বছরের বেশি বয়সি পুরুষ ও ৫৫ বছরের বেশি বয়সি নারীর ক্ষেত্রে কিংবা পরিবারের ইতিহাসে যদি করোনারি ধমনি সংক্রান্ত ব্যাধির নজির থেকে থাকে তাহলে আরও কম বয়সে করোনারি বাইপাস করার বুঁকি দেখা দিতে পারে।

যখন করোনারি ধমনির লুমেন ৫০-৭০% সংকীর্ণ হয় তখন থেকেই  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ হৎপেশিতে কমে যায়। বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। প্রাকের চূড়ায় যদি রক্ত জমাট বাঁধে তাহলে পরিস্থিতি হার্ট অ্যাটাকের দিকে চলে যায়।

ধমনির লুমেন যদি ৯০-৯৯% সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন অস্থির অ্যানজাইনা (unstable angina) ঘৰান্বিত হয়। এমন অবস্থায় করোনারি বাইপাস কার্যক্রম গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না।



চিত্র ৪.৩২ : করোনারি বাইপাস সার্জারি (বাম পা থেকে শিরা এনে করোনারি ধমনিতে সংযোজন)

করোনারি বাইপাস একটি জটিল প্রক্রিয়া। রোগ শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় হৃদচিকিৎসক প্রথমে করোনারি ধমনির রোগের সঠিক অবস্থান, ধরন ও ব্যাপকতা নির্ণয় করেন। পরবর্তী ধাপে রোগীর হৃৎপিণ্ড, বয়স, লক্ষণের ব্যাপকতা, অন্যান্য অসুখ-বিসুখের অবস্থা ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি বিবেচনা করে হৃদ ও শল্যচিকিৎসক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন। বন্ধ করোনারি ধমনিকে এড়িয়ে ডিম্পল নির্মাণ করতে বুক, হাত, পা ও তলপেট থেকে ধমনি সংগ্রহ করা হয়। কয়টি করোনারি ধমনি বাইপাস করতে হবে তার উপর নির্ভর করে অঙ্গোপচারের সময়কাল। সাধারণত ৩-৫ ঘন্টা সময়ের মধ্যে বাইপাস কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে রোগী হাসপাতাল ত্যাগ করতে পারেন। কোন জটিলতা না থাকলে ২ মাসের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে যান। এরপর থেকে রোগীকে নিয়মিত চেকআপের মধ্যে থাকতে হয়।

### বিধিনিষেধ

বাইপাস সার্জারির পর রোগীকে বেশকিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন- ধূমপান ত্যাগ, কোলেস্টেরলের চিকিৎসা, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত নির্ধারিত ব্যায়াম, স্বাস্থ্যসম্মত ওজন বজায় রাখা, হৃদ-বন্ধব ভোজনে অভ্যন্তর হওয়া, চাপ ও রাগ নিয়ন্ত্রণে আনা, নির্ধারিত ওষুধ সেবন এবং চিকিৎসকের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করা।

### ৪. এনজিওপ্লাস্টি (Angioplasty)

বড় ধরনের অঙ্গোপচার না করে হৃৎপিণ্ডের সংকীর্ণ লুমেন (গহৰ)-যুক্ত বা বন্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনি পুনরায় প্রশস্ত লুমেনযুক্ত বা উন্মুক্ত করার পদ্ধতিকে এনজিওপ্লাস্টি (angio = রক্তবাহিকা + plasty = পুনর্নির্মাণ) বা করোনারি এনজিওপ্লাস্টি (coronary angioplasty) বলে। এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সরু বা বন্ধ হয়ে যাওয়া লুমেনের ভিতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডে পর্যাপ্ত  $O_2$  সরবরাহ নিশ্চিত করে হৃৎপিণ্ড ও দেহকে সচল রাখা। বুকে ব্যথা (অ্যানজাইনা), হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তির সহজ উপায় এনজিওপ্লাস্টি। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মান কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অ্যানড্রেস গ্রেন্টিগ (Dr. Andreas Gruentzig) সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

### এনজিওপ্লাস্টির প্রকারভেদ

এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্লাক জমা বা রক্ত জমাটের কারণে সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া বা রুক্ষ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) চওড়া করে  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ অঙ্গুল রাখা। প্লাকের ধরন ও অবস্থান অনুযায়ী এনজিওপ্লাস্টির ধরনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এনজিওপ্লাস্টি নিচে বর্ণিত ৪ ধরনের।

১. **বেলুন এনজিওপ্লাস্টি (Balloon angioplasty)**: এ ক্ষেত্রে একটি বেলুন ক্যাথেটার (balloon catheter) ধমনিতে প্রবেশ করিয়ে কোলেস্টেরলের পিণ্ডগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং রক্তনালিকে খোলা রাখতে সেখানে প্রায়ই একটি স্টেন্ট স্থাপন করা হয়।

২. **লেজার এনজিওপ্লাস্টি (Lesser angioplasty)**: এ ধরনের এনজিওপ্লাস্টিতে ক্যাথেটারের আগায় বেলুনের পরিবর্তে একটি লেজার লাগানো থাকে। করোনারি ধমনির প্লাকযুক্ত অংশে পৌছে লেজার রশ্মি স্তরে প্লাক ধ্বংস করে এবং গ্যাসীয় কণায় বাস্পীভূত করে দেয়। শুধু লেজার নয়, এ প্রক্রিয়াটি বেলুন এনজিওপ্লাস্টির পাশাপাশি প্রয়োগ করা যায়।



চিত্র ৪.৩০ : বিভিন্ন ধরনের এনজিওপ্লাস্টি

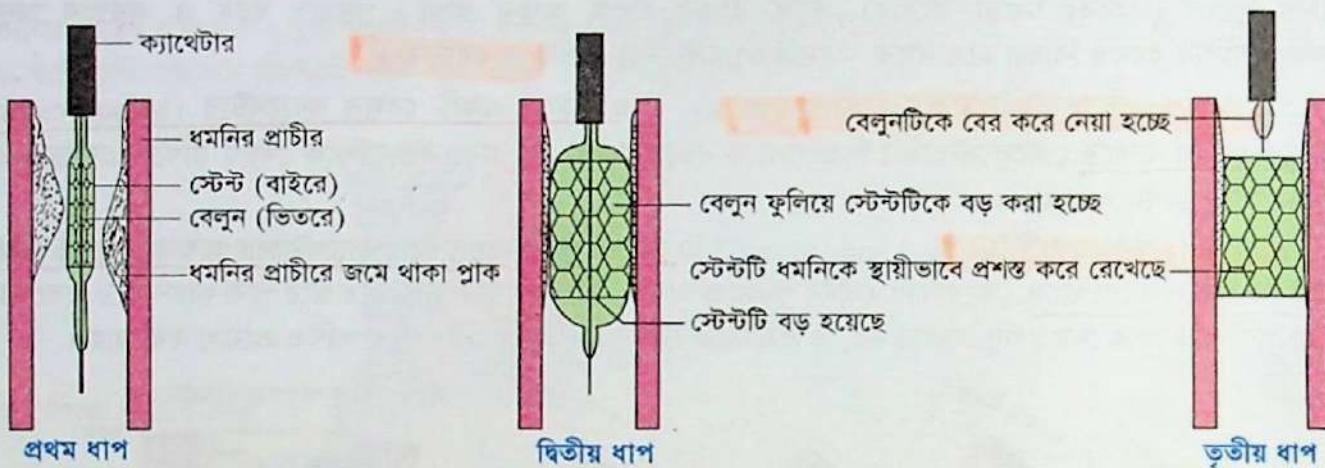
৩. **করোনারি অ্যাথেরেকটমি (Coronary atherectomy)**: এটি এনজিওপ্লাস্টির মতো একটি প্রযুক্তি তবে এক্ষেত্রে ধমনি-প্রাচীরের প্লাককে বেলুনের সাহায্যে চেপে লুমেন প্রশস্ত করার পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, যেমন ক্ষুদ্র ঘূর্ণী গ্রেড, ড্রিল, বেলুন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

৪. **করোনারি স্টেন্টিং (Coronary stenting)**: স্টেন্ট হচ্ছে ক্ষুদ্র কিস্তি প্রসারণযোগ্য, ধাতব যন্ত্র যা এনজিওপ্লাস্টি সম্পর্কে হলে ক্যাথেটারের সাহায্যে সংকীর্ণ ধমনি-লুমেনে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। লুমেন যেন আবারও সংকীর্ণ না হতে পারে সে কারণে স্টেন্ট-কে সেখানেই রেখে দেয়া হয়। অর্থাৎ যাদের করোনারি ধমনি বেশ নাজুক তাদের ক্ষেত্রে স্টেন্ট অত্যন্ত উপযোগী।

### এনজিওপ্লাস্টি প্রক্রিয়া

এনজিওগ্রাম (angiogram) করে নিশ্চিত হওয়ার পর এ ধরনের সার্জারি করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রমে উর্ধ্ববাহু বা পা-এর একটি অংশ কেঁটে ধমনির ভিতর দিয়ে পাতলা নল বা ক্যাথেটার (catheter) প্রবেশ করিয়ে কৌশলে রুক্ষ বা আংশিক বুজে যাওয়া ধমনিতে পৌছানো হয়। ক্যাথেটারে একটি সরু তার, তারের অগ্রভাগে একটি চুপসানো বেলুন

ও বেলুনটির চারদিকে একটি ধাতব তারের জালের চোঙ বসানো থাকে। জালিকাটিকে স্টেন্ট (stent) বলে। স্টেন্টটি সাধারণত বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মিত। এখন অবশ্য অন্যান্য ধাতব বা বিশেষ ধরনের সুতার তৈরি স্টেন্টও ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৪.৩৪ : করোনারি স্টেন্টিং এনজিওপ্লাস্টির বিভিন্ন ধাপ (চিরানুগ)

স্টেন্টসহ বেলুন কাঞ্চিত জায়গায় পৌছালে বেলুনটি বাইরে থেকে ফোলানো হয়। বেলুনের সাথে সাথে স্টেন্টও স্ফীত হয় এবং প্রতিবন্ধক স্থানে চাপ দিতে থাকে। চাপের ফলে ধমনির গহ্বরের প্রতিবন্ধক স্থানে চর্বিযুক্ত পদার্থও নিষ্পেশিত হয় এবং সংকীর্ণ ধমনিগহ্বর প্রশস্ত হয়। ধমনির ভিতরে তখন রক্ত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এর পর সেন্টেটি ধমনি গহ্বরে রেখে দিয়েই বেলুন সঞ্চুচিত করে বাইরে বের করে আনা হয়। স্টেন্ট সবসময় ধমনির অঙ্গপ্রাচীরকে বাইরের দিকে চেপে রাখে বলে ধমনির ভিতরে সহজে চর্বিপদার্থ (অ্যাথেরোমা/ব্লক) জমতে পারেনা। স্টেন্টের গায়ে এক ধরনের প্রলেপ লাগানো থাকে যা চর্বি গলিয়ে ধমনিকে পুনরায় সংকীর্ণ হওয়া থেকে রক্ষা করে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে ৩০ মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে।

### এনজিওপ্লাস্টির উপকারিতা

করোনারি হৃদরোগের অন্যতম প্রধান রোগ সৃষ্টি হয় করোনারি ধমনিতে। ধমনির ভিতর ব্লক সৃষ্টি হলে পর্যাপ্ত  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত হৎপেশিতে সংবহিত হতে পারে না। ফলে হার্ট ফেইলিউর ও হার্ট অ্যাটাকের মতো মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এমন মারাত্মক অবস্থা মোকাবিলায় এনজিওপাস্টি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এনজিওপ্লাস্টি ধমনির লুমেন থেকে ব্লক অপসারণ বা হ্রাস করতে পারে এবং শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা উপশম হয়। হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমিয়ে জীবন রক্ষায় অবদান রাখে। যেহেতু ব্লক উন্মুক্ত করতে হয় না সেহেতু কষ্ট, সংক্রমণ ও দীর্ঘকালীন সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে না। মাত্র এক থেকে কয়েক ঘণ্টায় জীবন রক্ষাকারী এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে পারে এবং কয়েক দিন পর থেকেই হালকা কাজকর্ম করা সম্ভব। সুস্থ হতে ৪ সপ্তাহের বেশি লাগে না।

যাঁরা বৃক্কের অসুখে ভুগছেন, কিংবা এনজিওগ্রামের সময় রঞ্জকের প্রতি অ্যালার্জি দেখা দেয় এবং যাঁদের বয়স ৭৫ বছরের বেশি তাঁদের ক্ষেত্রে এনজিওপ্লাস্টি কিছুটা অসুবিধাজনক হতে পারে।

**স্বাস্থ্য বুঁকি :** অধিকাংশ ক্ষেত্রে এনজিওপ্লাস্টির তেমন কোনো সমস্যা থাকে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি বেশ বুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার শুরুতে, বিশেষত স্টেন্টিং করার সময় ২% রোগীর ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। আবার বেলুন ছিড়ে কিংবা স্টেন্ট চুপসে রক্ত চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। ক্যাথেটার প্রবেশের সময় ধমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এনজিওপ্লাস্টি করার পর রোগীর বিপদের সম্ভাবনা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রিং লাগানো অংশটিতে রক্ত জমাট বাঁধে এবং জমাটবন্ধ রক্ত ছুটে গিয়ে মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালিকে রক্ষণ করে স্ট্রোক ঘটাতে পারে। আবার রিং-এর ভিতরে কয়েক মাস বা এক বছরের মধ্যে নতুন করে অ্যাথেরোমা সৃষ্টি হতে পারে।

### এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শুরুভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. রক্ত বিশেষ ধরনের প্রবহমান তরল যোজক টিস্যু যা অধিক আয়নিক ঘনত্বের দ্রবণ **প্রাজমা** ও রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত এবং যা হৃৎপিণ্ড ও বন্ধ রক্তনালির মাধ্যমে সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয়।
২. রক্তের দৈর্ঘ্য ক্ষারধর্মী হালকা হলুদ বর্ণের অকোষী তরল অংশকে **প্রাজমা** বা **রক্তরস** বলে।
৩. রক্ত সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে পানি, খাদ্যসার, অক্সিজেন, এনজাইম, হরমোন প্রভৃতি কোষে সরবরাহ হয়, এবং দেহের তাপ, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অ্যামোনিয়ার মতো নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্যবস্তুসমূহ দেহ থেকে অপসারিত হয়।
৪. মানব জ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ে কুসুম থলিতে, শেষ পর্যায়ে যকৃতে এবং জন্মের পর থেকে অঙ্গিমজ্জাতে যে পদ্ধতিতে লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয় তাকে **এরিথ্রোপোয়েসিস** বলে।
৫. রক্তে লোহিত রক্তকণিকার আয়তন পরিমাপের শতকরা হিসেবকে **হেমাটোক্রিট** বলে। আয়তনের দিক দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা ৪৫% এবং মহিলাদের ৪০%।
৬. লসিকাজালিকা, লসিকানালি এবং লসিকাপর্বের সমন্বয়ে গঠিত লসিকাতন্ত্রের মধ্যে যে তরল দেখা যায় তার নাম **লসিকা**।
৭. অধিক চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকাতে ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকাকে দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে **কাইল** বলে।
৮. অন্ত্রের প্রাচীরের সুবিকশিত লসিকানালিকে **ল্যাকটিয়েল** বলে।
৯. যে প্রক্রিয়ায় কেটে যাওয়া স্থানে বা ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট বেঁধে দেহ হতে অবাঙ্গিত রক্তপাত বন্ধ করে তাকে **রক্ততঁত্ব প্রক্রিয়া** বলে।
১০. হৃৎপেশি নামক অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত রক্ত সংবহনতন্ত্রের যে অঙ্গটি পাম্পের মতো সক্রোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সারাদেহে রক্ত সংঘালিত করে তাকে **হৃৎপিণ্ড** বলে। এটি ছান্দিক গতিতে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রক্ত বাহিকার মাধ্যমে ফিরে আসা রক্ত সংগ্রহ করে এবং পুনরায় তা বাহিকার মাধ্যমে সারাদেহে প্রেরণ করে।
১১. হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়া ও ভেন্ট্রিকলের পর্যায়ক্রমিক সক্রোচন (systole) ও প্রসারণ (diastole) কে **হৃৎস্পন্দন** (heart beat) বলে। এর মাধ্যমেই রক্ত দেহের অভ্যন্তরে গতিশীল থাকে।
১২. প্রবহমান রক্ত রক্তবাহিকার গায়ে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে **রক্তচাপ** বলে। একজন সুস্থ প্রাণবয়স্ক মানুষের সিস্টোলিক চাপ ১০০-১৩৯ (অপটিমাম ১২০ mmHg) মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৬০-৮৯ (অপটিমাম ৮০ mmHg) মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান হয়ে থাকে। **স্ফিগমোম্যানোমিটার** (sphygmomanometer) নামক যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের রক্তচাপ মাপা যায়।
১৩. হৃৎস্পন্দনের সময় হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে রক্ত চলাচলের জন্য ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি ঘটনা ঘটে। একটি হৃৎস্পন্দনে সংঘটিত ধারাবাহিক ঘটনার সমষ্টিকে **হৃৎক্র বা কার্ডিয়াক চক্র** বলে।
১৪. মানুষের হৃৎপিণ্ড স্নায়ুতন্ত্র, হরমোন বা অন্যকোনো উদ্দীপনা ছাড়া নিজেই স্পন্দন তৈরি করতে পারে। এজন্য একে **মায়োজেনিক হৃৎপিণ্ড** বলে। হৃৎপিণ্ডের বিশেষ ধরনের কিছু ক্রপাত্তরিত **সংযোগী টিস্যু** সম্পর্কিতভাবে হৃৎস্পন্দন উৎপাদন ও দ্রুত বিস্তার ঘটিয়ে হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে। সংযোগী টিস্যুগুলো হলো- **সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড** (SAN), **অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড** (AVN), **বাণ্ডল অব হিজ** এবং **পারকিঞ্জি তন্ত্র**।
১৫. রক্তনালিকার প্রাচীরে অবস্থিত বিশেষ সংবেদী স্নায়ুপ্রাত্তকে **ব্যারোরিসেপ্টর** বলে। এরা রক্তচাপ পরিবর্তনে সাড়া দিয়ে দেহে রক্তচাপের ভারসাম্য বা **হোমিওস্ট্যাসিস** পেজায় রাখে। রক্তনালিতে কোনো কারণে অস্বাভাবিক রক্তচাপ সৃষ্টি হলে ব্যারোরিসেপ্টর খুব দ্রুত এ উদ্দীপনা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে। এরপর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এ পদ্ধতিকে **ব্যারোরিফ্রেক্স** বলে।

১৬. মানুষের হৎপিণ্ডি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন করে। মানবদেহে প্রতি মিনিটে গড়ে ৭৫ বার হৎস্পন্দন সম্পন্ন হয়। হৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়াম সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোড (SAN) নামক বিশেষ ধরনের টিস্যু থেকে বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি হয়ে সমগ্র হৎপিণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে হৎস্পন্দন শুরু হয় এবং স্পন্দন ছন্দোময়তা বজায় থাকে। সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোডকে পেসমেকার বলে।
১৭. মানুষের রক্তসংবহনতন্ত্রে হৎপিণ্ডে রক্ত সিস্টেমিক চক্র ও পালমোনারি চক্র- এ দুটি চক্রে সম্পন্ন হয় বলে এ সংবহনকে দ্বিতীয় সংবহন (double circuit circulation) বলে।
১৮. যে সংবহনে রক্ত হৎপিণ্ডের বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে ধমনির মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশের জালকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ত্রি সকল জালক থেকে রক্ত শিরার মাধ্যমে হৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে তাকে সিস্টেমিক সংবহন বলে। এ সংবহনের মাধ্যমে দেহের সকল কোষ, টিস্যু ও অঙ্গে  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ হয় এবং  $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত হৎপিণ্ডে ফেরত আসে।
১৯. যে সংবহনে  $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত হৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসীয় ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে প্রেরিত হয় এবং ফুসফুস থেকে  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে হৎপিণ্ডে ফেরত আসে তাকে পালমোনারি সংবহন বলে।
২০. যে পদ্ধতিতে হৎপিণ্ডের নিজস্ব পেশিতে রক্ত সংবাহিত হয় তাকে করোনারি সংবহন বলে। সিস্টেমিক ধমনির গোড়ায় অবস্থিত করোনারি ধমনির মাধ্যমে হৎপিণ্ডের প্রাচীরে  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত সংবাহিত হয় এবং হৎপিণ্ডের প্রাচীর থেকে  $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে হৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।
২১. কোনো কোনো অঙ্গের কৈশিকজালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় কৈশিকজালিকায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের সংবহনকে পোর্টাল সংবহন বলে। মানবদেহে শুধু হেপাটিক বা ঘৃত পোর্টাল তন্ত্র বিদ্যমান। রেনাল বা বৃক্ষীয় পোর্টাল তন্ত্র থাকে না।
২২. হৎপিণ্ডের পেশিতে রক্ত সরবরাহকারী করোনারি ধমনির ভিতরের প্রাচীরে কোলেস্টেরল সঞ্চিত হলে এ ধরনের সঞ্চিত পদার্থকে অ্যাথেরোস্কেলেটিক প্লাক বা অ্যাথেরোমেটাস প্লাক বলে। এই প্লাকের জন্য ধমনির গহ্বর সরু হওয়ার ফলে হৎপেশিতে পর্যাপ্ত  $O_2$  ও পুষ্টি সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে করোনারি হৃদরোগ বা ইক্সিমিয়া বলে। অ্যানজাইনা, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর ইত্যাদি করোনারি হৃদরোগ। করোনারি ধমনির অস্বাভাবিকতার জন্য এ রোগগুলো সৃষ্টি হয়।
২৩. হৎপিণ্ডের কোন অংশে দীর্ঘদিন ধরে  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহের অভাব ঘটলে এই অংশের পেশিগুলো অকেজো হয়ে বা মরে গিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তাকে হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বলে।
২৪. চিকিৎসকরা যখন বক্ষের অস্থিকে কেটে হৎপিণ্ডকে উন্মুক্ত করেন এবং হৎপিণ্ডের স্পন্দন কমিয়ে অপারেশনের মাধ্যমে হার্টের সমস্যাগুলো দূরীভূত করেন তখন তাকে ওপেন হার্ট সার্জারি বলে।
২৫. করোনারি ধমনির ভিতরে ব্লক তৈরি হয়ে যদি হৎপেশিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বাধাগ্রস্ত হয় তবে উক্ত রক্ত বিকল্প আরেকটি পথে হৎপেশিতে পৌছানোর পদ্ধতিকে করোনারি বাইপাস বলে।
২৬. ক্যাথেটার হলো একটি নমনীয়, লম্বা ও সরু টিউব বিশেষ যার দ্বারা করোনারি ধমনির সরু হয়ে যাওয়া অংশে একটি করোনারি স্টেন্ট (coronary stent) বা রিং স্থাপন করা হয়। এটি যান্ত্রিক পেসমেকার ও এনজিওপ্লাস্টিতে ব্যবহার করা হয়।
২৭. এনজিওপ্লাস্টি হচ্ছে এক ধরনের চিকিৎসা, যার সাহায্যে ধমনির যে অংশে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজ ও রক্ত চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, সে জায়গাটিকে প্রসারিত করা হয়। এনজিওপ্লাস্টির ফলে করোনারি ধমনি দিয়ে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ঘটে এবং হৎপিণ্ড সচল থাকে।